মাহবুব উল আলম চৌধুরী

আলোর সন্ধানে দেশ

আলোর সন্ধানে দেশ

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ, বিএ অনার্স; এম এ
স্বত্বাধিকারী, পালক পাবলিশার্স
৮/২ নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
যোগাযোগ : ১৭৯/৩, ফকিরেরপুল
জিপিও বক্স নং ৪১৫, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৫৮১৬, মোবাইল : ০১৭২০৩০৮৮৬১

প্রকাশকাল
আশ্বিন ১৪১৫
সেপ্টেম্বর ২০০৮

গ্রন্থস্বত্ব
সাফিনা আহমেদ
ইশতিয়াক আহমেদ

প্রচ্ছদ
মোকতাদুল হক

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ একশত নব্বই টাকা

Alor Sandhaney Desh by Mahbub ul Alam Chowdhruy. Published by Forkan Ahmad. Proprietor, Palok Publishers, 8/2, North South Road, Purana Palton, Contact: 179/3, Fakierpool, GPO Box No. 415, Dhaka-1000, Bangladesh. Cover Designed by Moktadul Hoque, First Published August 2008, Price Tk-190.00 US $ 10

ISBN 984 445 234 01

এই কলামগুলো কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন। কোনো কোনো দিন একই সঙ্গে একাধিক দৈনিক-এর জন্যও লিখেছেন। তার সহকারী আবদুর রহিমের সাথে কম্পিউটারে বসে নিজেই সংশোধন বা সংযোজন করতেন। সকালে নাস্তা খেয়ে তার স্টাডি টেবিলে প্রতিদিনের অভ্যাসবশত বসে যেতেন আর নদীর স্রোতের মতো অনর্গল ডিকটেশন দিয়ে যেতেন। কোনোদিন তাকে একটুও ক্লান্তিবোধ করতে দেখিনি যতক্ষণ লেখা শেষ না হতো। তার ইচ্ছা ছিল এই কলামগুলো বই আকারে প্রকাশ করবেন। কিন্তু জীবনকালে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই বই তার হাতে তুলে দিতে পারিনি। এই বেদনা আমাকে অহরহ ব্যথিত করে।

লেখাগুলো তারিখ অনুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সংবাদপত্র টেলিফোনে নেয়া তাঁর কিছু প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। এই বইএর শেষে সেগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

তার পছন্দ মতো বইটি প্রকাশ করার জন্য আমার স্নেহাস্পদ প্রকাশক ফোরকান আহমদ বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। আবদুর রহিম, কবির সহকারী, রাতদিন অজস্র পরিশ্রম করে আমাকে সহায়তা করেছে। মোকতাদুল হক অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। তাদের সকলের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

জওশন আরা রহমান
২৫ জুন ২০০৮

সূচিক্রম

জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান চাই ৪
ব্যর্থতার এই দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে ৭
দলীয় লোক দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন গণবিরোধী ৯
পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে কতিপয় পরামর্শ ১১
স্বস্তি ফিরে আসুক ১৪
দেশ যাচ্ছে কোন দিকে ? ১৬
গণজাগরণ ও বজ্রাহত দৈত্য ১৯
একতরফা নির্বাচনের পরিণাম হবে ভয়াবহ ২১
বিজয় মাসের ভাবনা ২৩
ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কখনও জাতীয় ঐক্যের সেতুবন্ধ নয় ২৭
বিজয়ের জন্য গণজাগরণকে অব্যাহত রাখতে হবে ২৯
ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগই একমাত্র বিকল্প ৩১
আত্মসম্মান বিসর্জন ৩৪
সাদ্দামের ফাঁসি প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ৩৬
জনগণের আকাড়ার প্রতিফলন ৩৭
বিলম্ব হোক তবুও স্বচ্ছতা চাই ৩৯
ঘোড়া আগে না গাড়ি আগে ৪২
দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সামাজিক আন্দোলন ৪৫
জনপ্রত্যাশা পূরণের এখনই সময় ৪৮
সাহসী জননীর কাছে বুড়ো সন্তানের আকিঞ্চন ৫১
ছাত্র রাজনীতি : ফিরে আসুক পরীক্ষিত ভূমিকায় ৫৩
আলোর সন্ধানে দেশ ৫৬
চাঁদা, চাঁদাবাজি বনাম সংস্কার ৫৯
সাইফুদ্দিন খানের মৃত্যুতে ৬২
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক ৬৪
আজও কাঁদে শহীদের আত্মা ৬৬

সংবাদপত্রে মন্তব্য

জনগণ বিপন্নবোধ করছে ৬৮
ভাঙনের সুর বাজছে ৬৮
তিনি দেশের জন্যই প্রাণ দিয়েছেন ৬৯
গ্রামীণ ব্যাংক একটি মতাদর্শ ৭০
দুর্নীতিবাজদের বিরবদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ৭০
আশু বাস্তবায়ন চাই ৭১
চবি নাট্যকলা বন্ধের প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ ৭২
দুর্গত এলাকার নিঃস্ব ও অসহায় মানুষ কিস্তি শোধ করবে কিভাবে? ৭২

জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান চাই

আমি আগের একটি লেখায় লিখেছি সরকারের শেষের বছরটি অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিরোধী দলের আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন রাজপথে নামে দাবি আদায়ে। বরাবরই এর পুনরাবৃত্তি লক্ষ্যণীয়। ফলে দেশে বিরাজ করে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ। যা কারো কাম্য নয়।

সরকারকে চাপের মধ্যে ফেলে সবাই তৎপর নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে। অতীতে বহুবার এ রকম ঘটনা ঘটেছে। এখনো ঘটছে। আর সরকারও সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে এদের দাবিগুলো বিচার বিবেচনা কিংবা বিরোধীদলসহ অন্যান্য দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করেই মেনে নেয়। এটাকে গণতান্ত্রিক সরকারের পরিপন্থী বলা যেতে পারে। এরকম বহু ইস্যু রয়েছে, যা বিরোধীদের সাথে কথা না বলে সরকারই একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে যে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে তা নয়, বরং পরবর্তীতে বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা আমি প্রায় লেখাতে বলে থাকি। এর ফলে দুর্নীতির পরিমাণ যেমন হ্রাস পায়, তেমনি কঠিন সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব।

আগেই বলেছি, আমাদের যেকোনো সরকারের মেয়াদের শেষের বছরটি অত্যন্ত কঠিন রূপ ধারণ করে। গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্নরূপে আন্দোলনে নামে তাদের দাবি আদায়ে। এদের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োগকৃতরাও রয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে মাঠে নেমেছিল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা। তাদের দাবি ছিল ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রি ও মাস্টার্স শ্রেণীর সমমর্যাদা করণ। সরকার কোনো শর্ত ছাড়াই তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের রাজকপালই বলা যায়। কারণ তাদের মতো এত স্বল্প সময়ে কোনো সংগঠন দাবি আদায়ে সক্ষম হয়নি। এর কারণ সবারই জানা, মৌলবাদীদের খুশি করতেই সরকার তাদের এই দাবি বিনা শর্তে মেনে নিয়েছে। যা দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি দিক। আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার লেখাপড়ার মান এবং সিলেবাস অত্যন্ত নিম্নমানের। এখানে আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যা কিংবা ইসলামের উদারনৈতিক শিক্ষার বদলে মধ্যযুগীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়। ফলে মাদ্রাসাগুলো হয়ে ওঠে ধর্মান্ধতার কেন্দ্রস্থল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তাদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন কিংবা সিলেবাস পরিবর্তনের কোনো রকম শর্ত ছাড়াই ডিগ্রি ও মাস্টার্সের মর্যাদা দেয়া হল।

অথচ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন অনেক আগে শুরু করলেও তাদের দাবি দাওয়া মেনে নেয়া হয়নি। শিক্ষকদের কোনো কোনো অংশের দাবি নামমাত্র পূরণ করলেও অনেকাংশেরই দাবি পূরণ করা হয়নি। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সাংবাদিক সম্মেলন করে তাদের আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারা সরকারকে সময় দিয়েছে। এর মধ্যে তাদের দাবি না মানলে ১৭ সেপ্টেম্বর মুক্তাঙ্গনে মহাসমাবেশ করে অনশনে যাবে।

শিক্ষকদের আন্দোলন শুরু হয় কয়েক মাস আগে। প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষকেরা আন্দোলনে নামে। তারপর একে একে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিভিন্ন মাদ্রাসা, সরকারি বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা আন্দোলনে যোগ দেয়। অনশন, থালা হাতে ভুখা মিছিল, সমাবেশ, স্মারকলিপি প্রদান কত পন্থাই না অবলম্বন করেছেন।

আন্দোলনরত এসব শিক্ষকদের মধ্যে দেখা যায় কমিউনিটি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার প্রতি অমানবিক আচরণ। এই অসহিষ্ণু, দুর্মূল্যের বাজারেও একজন কমিউনিটি শিক্ষকের মাসিক বেতন ৭৫০ টাকা। শিক্ষকদের প্রতি এই রকম আচরণ শুধু অমানবিক নয়, আমাদের জন্য লজ্জাজনকও বটে। তবে চলতি বছরের ন্যায় শিক্ষকদের এত ব্যাপক আন্দোলন আর দেখা যায়নি। ১৯৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতায় আসলে শিক্ষকরা তখন তাদের দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করেছিল।

শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে অনেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশও বলে থাকেন। কিন্তু এটা মোটেও সত্য নয়। শিক্ষকদের পিঠ দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া। সীমিত আয়ে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সরকার কথায় কথায় বলে থাকে মানুষের আয়

বেড়েছে। তাই জিনিসপত্রের এই উর্ধ্বমূল্য সাধারণের জীবনযাপনে কোনো প্রকার প্রভাব পড়েনি। আয় বেড়েছে ঠিকই, তবে তা সরকারি দলের এমপি, মন্ত্রী, নেতাকর্মীদের। সাধারণ মানুষের নয়।

গত ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে খালেদা জিয়া বলেছিল, আমরা ক্ষমতায় গেলে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন ১০০ ভাগে উন্নীত, জাতীয়করণ করাসহ সকল সমস্যা দূর করবো। শিক্ষকরা দীর্ঘ সাড়ে চার বছর অপেক্ষা করলেও সরকার এসব সমস্যার দিকে নজর দেয়নি। বর্তমান সরকারের শেষ বাজেটেও শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের কোনো দিকনির্দেশনা না থাকায় বাধ্য হয়ে তারা রাজপথে নামে। এটাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আন্দোলনের সময় শিক্ষকরাই বলেছে, রাজপথ আমাদের জন্য নয়। শিক্ষাপীঠ থেকে রাজপথে নামতে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে।

এই আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার্থীরা। এর ফলে প্রায় সকল বিদ্যাপীঠ বন্ধ থাকে দীর্ঘদিন। শিক্ষার্থীদের এই গ্যাপ পূরণ কোনোমতেই সম্ভব নয়। সরকার যদি প্রথমেই এ বিষয়টি আমলে নিতো, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি এই পর্যায়ে আসতো না।

আমার কথা হচ্ছে শিক্ষকরা বিদ্যালয় ছেড়ে কেন রাজপথে নামবে? মানুষ গড়ার কারিগর বলে খ্যাত শিক্ষকদের সব সময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল সমস্যার সমাধান করা উচিত।। কিন্তু আমাদের সরকারগুলোর কাছে শিক্ষক সমাজ বরাবরই ছিল উপেক্ষিত। যা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ও উন্নত জাতি গঠনের অন্তরায়। বর্তমান সরকারের আমলে একটি বিষয় লক্ষণীয়। কোনো কিছু চরম পর্যায়ে পৌঁছার আগে সরকার তার প্রতি গুরুত্ব দেয় না। যা সরকারের দায়িত্বের চরম অবহেলাই প্রমাণ করে। কানসাট থেকে শুরু করে এশিয়া এনার্জির বিরুদ্ধে আন্দোলন তারই স্বাক্ষর বহন করে। কানসাটের জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতিও সরকার প্রথমে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি। বরং তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমনের পাঁয়তারা করে ফলে জনগণও ফুঁসে ওঠে, পুলিশের গুলিতে মারা যায় ১৮ জন গ্রামবাসী। শেষ পর্যন্ত তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয় সরকার। ঠিক একই রকম আন্দোলনের প্রতিফলন দেখেছি আমরা শনির আখড়ায়। দেখেছি গার্মেন্টস সেক্টরে। পোশাক শিল্প আমাদের প্রধান রফতানি পণ্য। দীর্ঘদিন ধরে এই খাতে চলে আসছে নৈরাজ্য। শ্রমিকদের ওপর করা হয় নির্যাতন, বঞ্চিত করা হয় ন্যায্য পাওনা থেকে। এ ব্যাপারে সরকার কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় মালিকপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামাফিক, অমানবিকভাবে শ্রমিকদের খাটাতো। শ্রমিকেরা বিভিন্ন সময় এসব ব্যাপারে দাবি জানালেও কোনো প্রতিকার না পেয়ে সহিংস পথে যেতে বাধ্য হয়। এই শ্রমিকদের ব্যাপারে আগে চিন্তাভাবনা করলেও পোশাক শিল্প এত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতো না। ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জির সাথে দেশের স্বার্থবিরোধী অসম চুক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণ প্রতিরোধ সংগ্রামে জেগে ওঠে। কিন্তু এ ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ না করায় পুলিশের গুলিতে মারা যায় ৬ জন গ্রামবাসী। অবশেষে তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয় সরকার। অভিযোগ রয়েছে, সরকার এক্ষেত্রেও জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে। কেননা এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছে না সরকার। জনগণকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আন্দোলন থেকে বিরত রাখার অপকৌশল অবলম্বন করেছে। সরকার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সাময়িকভাবে এ আন্দোলন বন্ধ করলেও ওদের বুকের আগুন এখনও জ্বলছে। হঠাৎ করে আবার দাবানল ছড়িয়ে পড়তে পারে।

শিক্ষকদের বেলাও ঠিক একই কথা বলব, আন্দোলনের পূর্বে যদি তাদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করত, তাহলে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাবর্ষ থেকে এই মূল্যবান সময় হারাতো না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজায় তালা ঝুলতো না। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করছি সরকার কোনো বিষয়ে সহিংস পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত গুরুত্ব দেয় না। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে জনসাধারণকে প্রতিটি পদে পদে মূল্য দিতে হচ্ছে।

আমি বলেছি, শিক্ষক সমাজের প্রতি আমরা অমানবিক আচরণ করে থাকি। এটা যেমন ঠিক তেমনি শিক্ষকদের বড় এটা অংশের দায়িত্বে রয়েছে চরম অবহেলা। বিশেষ করে সরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষকরা। অনেক সময় তারা শিক্ষার্থী কিংবা অভিভাবকদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে থাকেন। যার প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর পড়ছে। বেশিরভাগ শিক্ষকই নিয়োগ পেয়ে থাকেন দলীয়করণ কিংবা উৎকোচের বিনিময়ে, দুর্নীতির মাধ্যমে। ফলে তারা প্রতি পদক্ষেপে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ভালোভাবে পড়ানোর দায়িত্ব থাকলেও তারা ক্লাসে না পড়িয়ে বাসায় কিংবা কোচিংয়ে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করে। অন্যথায়

পরীক্ষায় পাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে একজন শিক্ষার্থীকে তার পাঠ শেষ করার জন্য স্কুলে এবং কোচিংয়ে দ্বিগুণ সময় দিতে হচ্ছে। যা শুধু স্কুল চলাকালীন সময়ে করার কথা। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে এবং সর্বদাই তারা মানসিকভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। শুধু তাই নয়, অনেক শিক্ষক বদলি কাউকে দায়িত্ব দিয়ে নির্বিঘ্নে দৈনন্দিন কাজগুলো সম্পাদন করে থাকেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকেন বলে অভিযোগ আছে। এসব ব্যাপারে কখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আমরা দেখিনি।

দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশিরভাগ মালিকদের দৃষ্টি অর্থ উপার্জনের দিকে। বিনিয়োগের দিক থেকে সবচেয়ে নিরাপদ এবং প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকায় অনেকেই এই বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতো বাড়ি বাড়ি গড়ে উঠছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিম্নমানের শিক্ষকরা নিয়োগ পেয়ে থাকেন এবং শিক্ষার মানও আশানুরূপ নয়। অতিরিক্ত লাভে আশায় ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ-তিনগুণ ছাত্র ভর্তি করে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো অতিরিক্ত হারে টিউশন ফি আদায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্তরা পড়ার সুযোগ পায় না এখানে। উচ্চবিত্ত কিংবা দুর্নীতিবাজ ছাড়া তাদের সন্তানদের এখানে পড়ানো দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এই সকল বিষয়ে সরকার কোনো উচ্চবাচ্য করে না। অভিযোগ আছে, এসব বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে সরকারি দলের এমপি, মন্ত্রীরা। সরকারি কোনো বিধিবিধান না থাকার দরুণ এরা যে যার ইচ্ছামতো অর্থ উপার্জন করে যাচ্ছে। অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করে এদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা উচিত এবং ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা উচিত।

সবশেষে বলতে চাই, শিক্ষকদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, আবার যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়। ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টার্সের মর্যাদা দেওয়ার মতো একটা হটকারী সিদ্ধান্ত যদি সরকার নিতে পারে, তাহলে শিক্ষকদের দাবির প্রতি এই অবহেলা কেন?

এই লেখায় আমি শিক্ষক সমাজের প্রতি সরকারের উদাসীনতার কথা যেমন বলেছি, তেমনি কর্তব্যকর্মে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবহেলাকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শিক্ষকতা একটি মর্যাদাবান পেশা। এই মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যাপারে সরকারের বিশেষ নজর দেয়া উচিত। শিক্ষকরা যেন সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন সেজন্য তাদের জবাবদিহিতায় আনা প্রয়োজন। ঘুষ, কিংবা দলীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে মেধাবী ছাত্রদের এই পেশায় আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা খুবই দরকার। তা না-হলে আমাদের শিক্ষার বর্তমান এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর নয়।

দৈনিক যুগান্তর
১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬

ব্যর্থতার এই দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে

সাগরপাড়ে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে জেলেদের আত্মীয়-স্বজনরা, লাশের খোঁজে। দীর্ঘ কয়েকদিনে সাগরে ডুবে যাওয়া লাশ ফুলে চেহারার বিকৃতি ঘটেছে। চেনার কোনো উপায় নেই। ভেসে এসে অনেক লাশ চরে ঠেকছে। শেয়াল, কুকুর, কাক এসব লাশ খেয়ে ফেলছে। ফলে শনাক্ত করার মতো কোনো চিহ্নই থাকছে না। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারিদিকে। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। নৌ-বাহিনীর জাহাজ শহীদ ফরিদ-এর ক্যাপ্টেন এখনো নিখোঁজ। তাকে উদ্ধারের জন্য স্মরণকালের বৃহত্তম উদ্ধার অভিযানে নেমেছে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী। 'মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ' নামের এ অভিযানে অংশ নিয়েছে ১১টি জাহাজ, ফ্রিগেট, টাগবোট, হেলিকপ্টার, হারকিউলিস উড়োজাহাজ। তবে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ।

হঠাৎ প্রকৃতির অপ্রত্যাশিত তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় দেশের উপকূলীয় এলাকাসহ বেশ কিছু এলাকা। ডুবে যায় শত শত মাছ ধরার ট্রলার। এখনো নিখোঁজ রয়েছে প্রায় দুই শতাধিক ট্রলার এবং কয়েক সহস্র জেলে। কিন্তু কেন এত বড় দুর্ঘটনার শিকার হলো, তা নিয়েও চলছে বিতর্ক। উদ্ধারকৃত বেঁচে যাওয়া জেলেরা বলছে, তাদের আগাম কোনো সংকেত দেয়া হয়নি। আর আবহাওয়া অফিসও তাদের ব্যর্থতা স্বীকার করতে অপারগ।

আমাদের দেশে প্রায় প্রতিবছরই এ সময়টাতে এরকম লঘুচাপ, নিবচাপ, স্থল নিবচাপ হয়ে থাকে এবং প্রায় সময়ই এই দুর্ঘটনার শিকার হয় দরিদ্র জেলেরা। কিন্তু আবহাওয়া অফিসের দেয়া তথ্যমতে এই সামান্য ঝড়ে এত ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা এই প্রথম। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় সামান্য বাতাস কিংবা বৃষ্টি হলেই আবহাওয়া অধিদপ্তর ২/৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু এরকম ভয়াবহ ঝড়ের আগে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখানো হয়েছে, এ নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। সঠিক সময়ে যথাযথ সংকেত দেখানো হলে এতবড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে হয়তো রক্ষা পাওয়া যেত। অবশ্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এখনো বলছেন, তাদের এই সতর্ক বাণী সঠিক ছিল। এরপর যাদের এ সতর্ক বাণী সমুদ্রে অবস্থানরত জলযানসমূহে পাঠানোর দায়িত্ব, তারাও সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনি বলে এ দুর্ঘটনা ঘটল।

আসলে আবহাওয়া অধিদপ্তর যতই দোষ এড়ানোর চেষ্টা করুক, দোষ কিন্তু তাদের ঘাড়েই বর্তায়। আমাদের আবহাওয়া অফিসে যেমন রয়েছে দক্ষ লোকের অভাব, তেমনি মান্ধাতার আমলের সেই পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়েও আবহাওয়া সঠিকভাবে নিরূপন করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে ঢাকার বাইরের আবহাওয়া অফিসগুলোর বর্তমান অবস্থা খুবই নাজুক। আর সেদিন সম্ভবত তারা সাগরে বাতাসের প্রকৃত গতিবেগ নির্ণয় করতে না পারায় ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখিয়েছে এবং সাবধানে চলাচল করতে বলেছে। অতীতেও আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ লোকের অভাবের দরুণ এ ধরনের নির্মম প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে জেলে এবং সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকার মানুষেরা। আবহাওয়ার সতর্কবাণী নির্ণয় করতে আমাদের নির্ভর করতে হয় পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের আবহাওয়ার পূর্বাভাষের ওপর। ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের দেয়া পূর্বাভাষের ওপর নির্ভর করে আসছি সেই কবে থেকে, এখনো সে অবস্থায়ই চলছে। কবে নাগাদ আমরা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাব তাও জানা নেই।

উল্লেখ্য, আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা এবং প্রধানমন্ত্রী উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। অভিযোগ আছে, আমাদের বাজেটের সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ থাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে। আর সেজন্যই জনসমক্ষে উক্ত বাজেটের অঙ্ক পেশ করা হয় না। এদের সুযোগ-সুবিধাও খুব বেশি দেয়া হয়। যা পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর কোথাও দেখা যায় কিনা আমার জানা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, শত শত কোটি টাকা উক্ত মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ দিলেও এত বছরেও কেন আবহাওয়া অধিদপ্তর আধুনিকায়ন করা হলো না ?

বাংলাদেশকে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বললেও ভুল হবে না। প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছি আমরা। জনগণকে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপারে আগে থেকে সতর্ক করলে কিংবা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে ব্যাপক আকারের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এতদসত্ত্বেও এই বিষয়টি সকল সময়েই অবহেলিত থাকে।

বঙ্গোপসাগরের ওই লঘুচাপে শুধু সাগরে অসংখ্য জেলের সলিল সমাধিই হয়নি। এর প্রভাবে সারাদেশে একাধারে কয়েকদিন যাবত বৃষ্টি হওয়ায় কোথাও কোথাও আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে, গাছপালা উপড়ে গেছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে কিছু কিছু শহরে অপ্রতুল পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে বহু অঞ্চলে জলাবদ্ধতায় যানচলালের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং বস্তিগুলো সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে লাখ লাখ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে। একদিকে বন্যার পানি, অপরদিকে মাথার ওপর ছাদ না থাকায় বৃষ্টির পানি জনজীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। ফলে এসব এলাকায় বিশুদ্ধ পানি এবং খাবারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে গভীর হতাশায় ভুগছে দুর্দশাগ্রস্ত এলাকার মানুষেরা।

আমরা বরাবরই লক্ষ্য করছি, যখন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে, তখন দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের নিয়ে ত্রাণ ত্রাণ খেলায় মেতে ওঠে সরকার এবং সরকার দলীয় এমপি, মন্ত্রী, নেতাকর্মীরা। বিভিন্ন সংস্থা থেকে সাহায্য নিয়ে, সরকারি কোষাগারের ত্রাণ এবং টাকা পয়সা নিয়ে ত্রাণ বিতরণের নামে লুটতরাজ করে থাকে। এক একজন কোটি কোটি টাকা কামায়। এসব কুৎসিত মনোবৃত্তি আমরা যতদিন ত্যাগ করতে না পারব, ততদিন আমাদের দেশে এ অবস্থা বিরাজ করবে।

প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে বসবাস করে করে মানুষের মৃত্যু আমাদের কাছে এখন মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। আমরা এখন কারো মৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়ি না। মানুষ পৃথিবীতে একবারই আসে এবং জীবনকালে তাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। জেলেরা তাদের মহত্তম পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে মাছ ধরার কাজ। তারা আমাদের প্রাত্যহিক মাছের জোগান দেয় এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দূর-সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেও তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতে পারিনি। ফলে দুর্যোগ আবহাওয়ায় প্রতিবছর বহু জেলের সলিল সমাধি হয়। এ লজ্জা যেমন সরকারের, তেমনি সমাজেরও।

বিদেশে এ ধরনের মৃত্যুর জন্য সরকারকে জবাবদিহি করতে হয়। গাফিলতির জন্য সরকারের পতন ঘটে। অথচ আমাদের দেশের মানুষের জীবন এত সস্তা, যে আমরা শেয়াল-কুকুরের মতো মৃত্যুবরণ করলেও সরকারকে জবাবদিহি করতে হয় না। এই ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকে। সমাজেও এই নিয়ে কোনো ঝড় উঠে না।

সবশেষে বলতে চাই, আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের এই গাফিলতি বা ব্যর্থতার কারণে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, অসংখ্য মানুষের সলিল সমাধি হলো– এর দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি জেলে পরিবারকে ক্ষতিপূরণসহ সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ভবিষ্যতে আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। অবিলম্বে দোষী কর্মকর্তাদের শনাক্ত করে যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সমকাল
২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ॥ ১২ আশ্বিন ১৪১৩

দলীয় লোক দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন গণবিরোধী

আমরা কি জীবনের সকল ক্ষেত্রে অযোগ্যতার বদনাম বয়ে বেড়াবো? দেশ পরিচালনায় আমরা অযোগ্য। অর্থনৈতিক সুশৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আমরা অযোগ্য। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আমরা অযোগ্য। শিক্ষার উন্নতি বিধানে আমরা অযোগ্য। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা অযোগ্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নাগরিক দায়িত্ববোধ সবকিছুতেই যেন আমরা ব্যর্থ। একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানও আমরা যথাযথ যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারি না। যে গার্মেন্টস শিল্প থেকে কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে সেই সেক্টরে মালিক-শ্রমিকের সুসম্পর্ক আমরা এখনো সুনিশ্চিত করতে পারিনি।

এই যে আবহাওয়া দপ্তরের সময়মতো সতর্ক বাণী অঘোষিত থাকায় কয়েক হাজার জেলের সলিল সমাধি হলো– এর দায়-দায়িত্ব কে নেবে, সরকার ছাড়া? এই একটি ব্যাপারেই প্রমাণিত হয় দিনে দিনে আমরা সবকিছুতেই অযোগ্য এবং দায়িত্বহীন হয়ে পড়ছি।

লক্ষ্যহীনতা, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। আমাদের যোগ্যতার মাপকাঠি সবকিছুকে ছাড়িয়ে অর্থ, লুটপাট এবং সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছে। যে আদর্শকে সামনে রেখে লড়াই করে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, সেই চেতনায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আমাদের সমস্ত অর্জনকে আজ ধূলায় মিশিয়ে দিচ্ছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেশ এখন এক অনিশ্চয়তা এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের 'সংলাপ' নামক নাটকটি এখন 'প্রলাপ' নামক নাটকে পর্যবসিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুপ্ত জঙ্গি সংগঠনগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ৫০ জন রাজনীতিবিদসহ দেশের গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে। জঙ্গিদের শীর্ষনেতা বাংলা ভাই এবং শায়খ আবদুর রহমানসহ কয়েকজন জঙ্গি নেতার মৃত্যুদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও তাদের কনডেম সেলে না রেখে রাখা হয়েছে সুসজ্জিত একটি মনোরম বাড়িতে। তাদের সঙ্গে তাদের গুপ্ত সংগঠনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে তাদের সঙ্গে তাদের গুপ্ত সংগঠনের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এরফলে দেশে একাত্তর সালের চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সম্ভাব্য পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সরকার এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, যাতে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

বিরোধী দল স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে যদি কে.এম. হাসান এবং নির্বাচন কমিশনের প্রধান এম এ আজিজকে সরানো না হয়, তাহলে তারা নির্বাচনে যাবে না। তারা নির্বাচন প্রতিহত করবে। এ পর্যায়ে বার বার প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে দোষারোপ করে বলছেন, আসলে বিরোধী দল সুষ্ঠু নির্বাচন চায় না। তারা দেশকে এক কঠিন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে চায়। তারা হরতাল, অবরোধ এসব ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি দিয়ে দেশকে ধ্বংস করতে চায়। তিনি আরো বলেছেন, কারো দাবির ভিত্তিতে নয়, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সংবিধানের ভিত্তিতে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বিদ্যুৎ সংকট, পানি সংকট, অপশাসন, দুর্নীতি এবং সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অবাধ নির্বাচনের দাবিতে অবশ্যই বিরোধী দল আন্দোলনের অধিকার ভোগ করে। সেই অধিকার বলে তারা যদি হরতাল অবরোধ জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং তাদের এই দাবির পেছনে গণসমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়, তাহলে এটাকে ধ্বংসাত্মক কার্য হিসেবে ঘোষণা করা সম্পূর্ণ অনৈতিক। পাকিস্তান আমলেও আমরা দেখেছি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মানুষের দাবি আদায়ের সমস্ত সংগ্রামকে পাকিস্তানি শোষকেরা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বলে অভিহিত করতো। প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে জালিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে আমরা শঙ্কিত।

১৯৫২ সালে যদি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করতো, মোনেম খান, আইয়ুব খানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠিন আন্দোলন গড়ে না তুলত, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালিকে জাগিয়ে না তুলতো, তাহলে ৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতো না। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির স্বাধীকারের দাবিকে যখন আইয়ুব-ইয়াহিয়া খান রক্তের বন্যায় সঙিন ডুবিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল, তখন যদি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সূচনা না করতো, তাহলে বাংলাদেশ কোনোদিনই স্বাধীন হতো না।

যদি কোনো সরকার জনগণের দাবিকে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মেনে না নেয়, তার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে কঠিন অগ্নিগর্ভ সংগ্রাম গড়ে ওঠে। জোট সরকার বিরোধী দলের কোনো দাবিকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়নি এবং দিচ্ছে না বলে বিরোধী দলের হরতাল, অবরোধ এবং প্রয়োজনবোধে অসহযোগ আন্দোলনে নামবার নৈতিক অধিকার আছে। এই অধিকারকে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে, তাদের নিজস্ব ক্যাডার লেলিয়ে দিয়ে কোনোদিন স্তব্ধ করা যাবে না। 'বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বাস্তব হয়ে দাঁড়াবে।

বিরোধী দলের দাবি মেনে নেয়ার মাধ্যমেই এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার একমাত্র উপায়– পুলিশের নির্যাতনের মাধ্যমে নয়।

এরশাদ যখন পেছন দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়ে লুটপাট এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গিয়েছিল, তখন যদি বিরোধী দলসমূহ শেখ হাসিনা এবং বেগম জিয়ার নেতৃত্বে আপসহীন সংগ্রাম গড়ে না তুলতো, তাহলে তাকে কি ক্ষমতাচ্যুত করা যেত? দেশ আজ একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন। পার্থক্য শুধু এই, এখন এরশাদের জায়গায় স্থান করে নিয়েছেন বেগম জিয়া। আর তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আওয়ামী লীগসহ চৌদ্দ দল, বিকল্প ধারা এবং অন্যান্য বিরোধী দল।

কাজেই বিরোধী দলকে সংবিধান মানার উপদেশ সম্পূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক শোনাচ্ছে। কারণ বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি সংবিধানকে দলীয় স্বার্থে এবং ধর্মীয় উন্মাদনায় বার বার আঘাত করে সংবিধানের পবিত্রতা এবং প্রাণশক্তিকে সম্পূর্ণ নির্জীব করে দিয়েছে। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার দাবি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। স্বাধীন, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুনিশ্চিত করতে না পারে, তবে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার অবশ্যই বিরোধী দল দাবি করতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান যদি বিএনপির দলীয় ব্যক্তি হন এবং নির্বাচন কমিশনের প্রধানও যদি বিএনপির সমর্থক হন, যা ইতোমধ্যে তাদের কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে তাদের অধীনে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

অতএব, দেশকে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার জন্য বিরোধী দলের দাবিগুলো যেন সরকার মেনে নেয়। এটাই জনগণের প্রত্যাশা। কারণ, বিরোধী দলের সংস্কার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনার দাবি, বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের দাবি এখন আর শুধু বিরোধী দলের দাবি নয়। এটা দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

বিরোধী দলের দাবি– যা এখন জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে, তা না মানলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিভাবে গঠিত হবে? তা যদি প্রধানমন্ত্রীর উক্তি অনুযায়ী সংবিধানভিত্তিক হয়, তাহলে তার প্রধান হবেন কে.এম. হাসান এবং নির্বাচন কমিশনের প্রধান হবেন বিতর্কিত এম এ আজিজ। এরা উভয়ে দলীয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা তাদের কাছে আশা করা যায় না। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। কাজেই সংবিধানের দোহাই দিয়ে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রয়াস কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।

দৈনিক যুগান্তর
২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬

পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে কতিপয় পরামর্শ

ড. মুহাম্মদ ইউনূস একজন কাজের লোক। কথা বলার চেয়ে কাজ করা তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। তবে মাঝে মাঝে জাতির সংকটকালে তিনি দেশের স্বার্থকে সামনে রেখে কিছু প্রিয় / অপ্রিয় এবং সাহসী বক্তব্য জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। ড. কামাল হোসেনের গণফোরাম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দেশের রাজনৈতিক পার্টির কী ধরনের ভূমিকা হওয়া উচিত সে নিয়ে একটি চমৎকার ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণটি আমার মনে খুব রেখাপাত করেছিল। এখন হাতের কাছে ভাষণটি নেই বলে এই সংকটকালে সেই ভাষণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়ার লোভ সংবরণ করতে হলো।

ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ব্যাপারে তার সুচিন্তিত মতবাদ এবং তার সার্থক প্রয়োগ বিশ্ব সমাজকে বিস্মিত করেছে। আমি এটাকে মতবাদ বলে আখ্যা দিয়েছি এ কারণে যে– কোনো সত্য, আদৌ সত্য কি না তা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তিনি এই কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন দরিদ্র গ্রামবাসীর শ্রেয়বোধ বড় বড় বিত্তশালী শিল্পপতিদের চেয়ে অনেক বেশি প্রখর। এটা তিনি প্রমাণ করে ছাড়লেন যে, ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা ঋণখেলাপী হয় না। দেখা যায়, বিভিন্ন ব্যাংকের বড় অঙ্কের ঋণ গ্রহীতারা প্রায়শই ঋণখেলাপী হয়। তাদের মধ্যে ঋণখেলাপীর সংখ্যা শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগ। আর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের ঋণখেলাপীর সংখ্যা শতকরা .০৯ ভাগ। তার এই মতবাদ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে। পৃথিবীর বহুদেশে তার এই মডেল অনুকরণ করে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। এমনকি চীন দেশেও গ্রামীণ ব্যাংকের মডেল (ৎবঢ়ষরপধঃরড়হ) অনুসরণ করে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, যেসব দেশ গ্রামীণ ব্যাংকের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, সেসব দেশে ড. ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক অর্থ, পরামর্শ, উপদেশ, কারিগরি সহায়তা দিয়ে সাহায্য করে আসছে। এভাবে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

দেশে অনেকে আছেন, যারা তার এই কার্যক্রমকে মহাজনী প্রথা আখ্যা দিয়ে তার গৌরবকে ক্ষুণ্ন করতে চান। কিংবা এটা বিশ্বাসও করেন। কোনো একটা ভালো কাজ নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। বিতর্কও থাকতে পারে। কিন্তু তিনি এই প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে যে কর্মোদ্যম সৃষ্টি করতে পেরেছেন এবং এসব গরিব মানুষেরা যে উপকৃত হচ্ছেন তার প্রমাণ পাই যখন দেখি এসব গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরা পেশাগত দিক দিয়ে কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউ চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে। তিনি বছরের কোনো এক সময় গ্রামীন ব্যাংক মিলনায়তনে এসব উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে এনে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। এতে অন্যান্য ঋণ গ্রহীতারাও উৎসাহিত হন এবং তাদের ছেলেমেয়েদেরকেও এভাবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

আমার এই লেখা প্রফেসর ইউনূস কিংবা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে লিখছি না। স্বদেশে-বিদেশে তিনি এত প্রশংসিত যে, আমার এই প্রশংসার সার্টিফিকেট তার এককোণেও ঠাঁই পাবে না। আমি তার প্রশংসাপূর্ণ কাজগুলোকে এখানে তুলে ধরেছি এই কারণে যে, যাতে তার বক্তব্য জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এবং তার ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আমার পরামর্শগুলোও প্রাধান্য পায়।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ বুধবার ড. ইউনূস সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) নাগরিক কমিটির বৈঠকে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য কিছু পরামর্শ' শীর্ষক যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করছি। তিনি আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "আমার জানামতে সরকারের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়ে বসে আছে। মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বাস্তবায়ন করার জন্য। কিন্তু মন্ত্রণালয় বিশেষ কোনো মহলের চাপে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে দেশের মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হতে পারে।" এবং আগামী নির্বাচিত সরকারের জন্য প্রথম একশ' দিনের কাজের তালিকাও তার ভাষণে তুলে ধরেছেন। তাতে বলেছেন, "দেশের স্বার্থে সকল সরকারকেই কিছু রূঢ়, অপ্রিয়

সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হলো প্রথম একশ' দিনের প্রথমভাগেই সবচেয়ে অপ্রিয় সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে নেয়া।"

আমি তার এ বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি ইতোপূর্বেও দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, যেন দেশবাসী সৎ এবং যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠায়। তার এই আবেদনও খুবই সময়োচিত। দেশের নাগরিক সমাজকে এ ব্যাপারে তাদের কোনো পরামর্শ থাকলে তাও দিতে বলেছেন মুহাম্মদ ইউনূস।

স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে গণতান্ত্রিক শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করা খুব কঠিন নয়। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, সকলের ভোট দেয়ার অধিকার থাকলে সকলের স্বার্থরক্ষা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়ত, ভোটের অজুহাতে জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয়। নির্বাচনে এই চেতনা প্রতিফলিত হয়। তিনি গণতন্ত্রকে সাম্য ও স্বাধীনতার কার্যকরী রূপ বলেও মনে করেন।

গণতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন এবং যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারাই সরকার গঠন করেন। কিন্তু গণতন্ত্রে সরকার ও বিরোধী দলের বিতর্কের মধ্যে শাসননীতি নির্ধারিত হয় বলে বিরোধী দলও সরকারের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের সংবিধানে এসব কথা উল্লেখ থাকলেও আমরা এখনো সম্পূর্ণভাবে দেশের শাসনকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে পারিনি। কারণ, গণতন্ত্র যে কয়েকটি মূলস্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত সেই স্তম্ভগুলো সম্পূর্ণভাবে মজবুত নয় বলে গণতন্ত্র পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। নির্বাচনে কোনো পার্টি বিজয় লাভ করলে পরাজিত পার্টিকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, কারচুপি হয়েছে। বিরোধী দল কোনো না কোনো অজুহাতে সংসদে উপস্থিত থাকে না। ফলে সরকার ও বিরোধী দলের বিতর্কের মধ্যদিয়ে আমাদের শাসননীতি গণতান্ত্রিক রূপ পায় না। সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ এত বেশি যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো একটি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি সংবিধানে সংযোজিত করেছি। তাতেও দেখা যাচ্ছে নির্বাচন অবাধ, স্বাধীন, নিরপেক্ষ নয় বলে পরাজিত পক্ষ মেনে নেয় না। তাই বার বারই সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে। পৃথিবীতে কোনো পদ্ধতিই নিখুঁত বা মোক্ষম নয়। আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলছি তাও অব্যর্থ নয়। প্রত্যেক পদ্ধতির মধ্যে কিছু না কিছু গলদ ও সীমাবদ্ধতা থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও তা আছে। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতাকে শনাক্ত করে তাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। কোনো সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে যখন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়, তখন যাতে সেই সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে তার জন্য সংবিধানে কিছু ভারসাম্য (পযবপশং ধহফ নধষধহপবং) আনা দরকার। অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যে বিতর্ক তার প্রধান কারণ– এক. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যিনি প্রধান হবেন, তিনি সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। তার পদটি সাংবিধানিক হলেও তাকে দলীয় ব্যক্তি মনে করে বিরোধী দল তার ওপর আস্থা রাখে না। দুই. নির্বাচন কমিশনও একটি সাংবিধানিক সংস্থা। এর প্রধানের পদটিও সাংবিধানিক। তিনিও ক্ষমতাসীন দলের দলীয় সমর্থক বলে তার ওপর বিরোধী দলের আস্থা থাকে না। দেশের প্রেসিডেন্টও দলীয় ব্যক্তি। কাজেই নির্বাচনে সরকারি দল ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনকে পক্ষপাতদুষ্ট করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরিত্র নিরপেক্ষ হয়, সেই পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। অর্থাৎ সংবিধানে এই ব্যাপারে পযবপশং ধহফ নধষধহপবং কিভাবে আনা যায় তা চিন্তা করতে হবে।

১. যেহেতু প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসীন দলের ভোটে নির্বাচিত হন। কাজেই তার দলীয় চরিত্র কিভাবে বদলানো যায়, তা ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলকে আলাপ-আলোচনায় বসে স্থির করতে হবে। ২. বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে যেন বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে সাংবিধানিক ব্যাপারে মতামত দিতে পারে। যেহেতু বিচার বিভাগের পদগুলো সাংবিধানিক হলেও তারা সাধারণত নিয়োগ পান প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদনক্রমে। কাজেই এ পদগুলো কিভাবে পযবপশং ধহফ নধষধহপবং-এর মাধ্যমে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ করে তোলা যায়, তাও সরকার এবং বিরোধী দলকে আলাপ-আলোচনায় বসে স্থির করতে হবে। ৩. দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সাংবাবিধানিক সংস্থা। দুর্নীতি দমন

বিভাগের প্রধান এবং সদস্যরা একই কারণে দলীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। এ ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দল আলাপ-আলোচনায় বসে কিভাবে এই পদটি নির্দলীয় করা যায়, সে সিদ্ধান্ত নেয়া অতীব প্রয়োজন। ৪. সরকারি প্রচার মাধ্যমকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ করে তুলতে হবে। যাতে তা বিবিসি জাতীয় প্রচার মাধ্যমের মতো সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

এসব ব্যাপারে দেশের সংবিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ আইনজীবীদের সাহায্য-সহায়তা নিতে হবে। প্রয়োজনবোধে পৃথিবীর সুখ্যাতিপূর্ণ আইন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। এই কাজগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাস সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হবে। যেন প্রতি নির্বাচনের আগে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে বার বার এই নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি না হয় এবং সাংবিধানিক সংকট দেখা না দেয়।

যেহেতু জুতা সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ পর্যন্ত সব ক্ষমতার অধিকারী সরকার, তাই দুর্নীতি প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতাকর্মী এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তার জন্য দরকার কেন্দ্রের হাতে কতিপয় বিষয়, যেমন প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় বাজেট ছাড়া সব ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যন্ত নির্বাচিত পরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তাতে দুর্নীতি যেমন কমবে, তেমনি উন্নয়নও সহজতর হবে। উন্নয়ন কাজের জন্য যাতে তৃণমূলের লোকদের বার বার কেন্দ্রে এসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে, বিভাগে ধর্ণা দিয়ে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে কাজ আদায় করতে না হয়, এ ব্যাপারেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইচ্ছা করলে কর্মসূচি হাতে নিতে পারে। তাদের সময়কালের মধ্যে যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে পরবর্তী সরকারের জন্য তারা এ ব্যাপারে সুপারিশমালা এবং পরামর্শ রেখে যেতে পারেন।

আমি যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছি তা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার এখতিয়ারের মধ্যে না পড়ে, তবুও তত্ত্বাবধায়ক সরকার উভয় পক্ষকে আলোচনার টেবিলে এনে উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অনুপ্রাণিত করবে। যেন বার বার এই সমস্যাগুলো এসে আমাদের সমাজকে অস্থির করে তুলতে না পারে।

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সংলাপ শুরু হওয়ার কথা, তাতে উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনায় থাকা দরকার, যাতে বার বার সংস্কারের দাবিতে বিরোধী দলকে রাজপথে নামতে না হয় এবং সাংবিধানিক পদগুলো যেন প্রশ্নবিদ্ধ না হয়।

দৈনিক যুগান্তর
৭ অক্টোবর ২০০৬

স্বস্তি ফিরে আসুক

বিচারপতি কে এম হাসান শপথ নেবেন না-- গতকালের পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হলে সংঘাত-সংঘর্ষের আশংকা অনেকখানি কমে যায়। আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের দাবি ছিল কে এম হাসানকে বাদ দিয়ে সাংবিধানিকভাবে যে কাউকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করা যাবে। খবরটি সত্য হলে জনমনে স্বস্তি ফিরে আসবে। আবার ভিন্ন ধরনের খবরও পাওয়া যাচ্ছে, চারদলীয় জোট সময়ক্ষেপণের কৌশল নিয়েছে। গণতন্ত্রের অব্যাহত যাত্রায় যে বাধা ছিল তা অপসারিত হলে মানুষ স্বভাবতই আনন্দিত হবে। জোট সরকার জেদের বশে এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘায়িত করায় আমরা একটি রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি। এখনও মেঘ কেটেছে-- বলা যাবে না। ক্ষমতাসীন দলের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা গণতন্ত্রের যাত্রা শুভ করার উদ্দেশ্যে তারা বিরোধী দলের সঙ্গে এই বিষয়ে একটি মতৈক্যে পৌঁছবেন। দেশের মানুষ শান্তি চায়, সংঘর্ষ চায় না। যে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাটিয়ে তোলা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। বিচারপতি কে এম হাসান শপথ নেবেন না-- এই খবর সঠিক হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সেই পরিবেশ যেন আরও সুস্থতর স্তরে চলে আসে তার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ সব শ্রেণী পেশার মানুষ যার যার অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে-- এটাই প্রত্যাশা।

বার বার যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ব্যাপারে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না হয় এবং সাংবিধানিক পদগুলো যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, তার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম কাজ হবে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ করে একটি স্থায়ী সমাধান বের করা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগে তিনটি নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু ২০০১ সালের মতো বিতর্ক কোনোটিতে হয়নি। তারপরও সংবিধান অনুযায়ী যার দায়িত্ব পাওয়ার কথা তাকে সে দায়িত্ব নিতে দেয়া হয়নি। আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে একটি গণতান্ত্রিক সরকার বলে মনে করি না। কারণ এটা জনপ্রতিনিধিত্ব করে না। ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নয়, তবুও মন্দের ভালো বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সমর্থন করি। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল উদ্দেশ্যই তার নির্দলীয় অবস্থান। যাতে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় তার জন্য সব দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা গ্রহণ করেছে। কিন্তু জোট সরকার দলীয় সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের অবসরের সময়সীমা দু'বছর বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তা না করা হলে বিতর্ক হতো না, বিরোধী দলেরও বলার কিছু ছিল না। এছাড়া নির্বাচন কমিশন প্রধানের পদটিও তারা দলীয় স্বার্থে নিজেদের লোক নিয়োগ করেছে। দীর্ঘকাল ধরে কেবল বিরোধী দল নয়, সুধী সমাজও তার অপসারণ চেয়েছে। কারণ বিতর্কিত ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশনের প্রধান করা হলে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হতে পারে না। আগেই আমি উল্লেখ করেছি, সব সময় যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ না হয় তার জন্য দায়িত্বশীলরা যেন এই দুটি পদ নিয়ে সংকট এড়ানোর চেষ্টা করেন। সমাধানের পথ খুঁজে বের করেন।

আমার একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলাম, সাংবিধানিক পদগুলো যাতে দলীয়করণ করা না যায় তার জন্য সংবিধানে এমন কিছু বিধান আনা দরকার যাতে এ ব্যাপারে চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকে। এই পদে যারা থাকবেন তারা অবশ্যই এদেশের নাগরিক এবং দেশের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেবেন। তাদের পক্ষপাতিত্ব রোধে সংবিধানে এমন কিছু সংশোধনী আনা দরকার যা এই পক্ষপাতিত্ব করার প্রবণতাকে রোধ করবে।

বর্তমানে দেশে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা উদ্বেগজনক। বিভিন্ন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ চলছে। পুলিশ-বিডিআর-র‍্যাব নামিয়ে এ সংঘাত বন্ধ করা যাবে না। কিংবা সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেও পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই খুঁজতে হবে। এই সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান। আমি মনে করি, কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন না-- এ রকম ঘোষণা দিলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এরপর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হবে সব দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এর

বিকল্প নেই। দেশবাসী দিন কাটাচ্ছে উদ্বেগের মধ্যে। সবার কাছে আবেদন, জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচি নয়, এমন কর্মসূচি নিন, যাতে রাষ্ট্র এবং জনগণের সম্পত্তি নষ্ট না হয়। যেন মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে। যেন সারাদেশে এমন একটি শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় যাতে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে।

দৈনিক যুগান্তর
২৯ অক্টোবর ২০০৬

দেশ যাচ্ছে কোনদিকে ?

রাষ্ট্রপতি যেদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন, সেদিন আমি এটাকে সঠিক পদক্ষেপ নয় বিবেচনা করে একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটির কয়েকটি চরণ এরকম–

আলোর প্রত্যাশী গোলাপ কুঁড়ি
ফুটে ওঠার জন্যে যখন আকুল হয়ে
সূর্যের দিকে তাকালে।
তখন হঠাৎ মেঘে ঢেকে গেল সূর্য।
শাড়ির আঁচলে বন্দি হলো আমাদের
বহু আকাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র।
একটি মুকুট বইবার শক্তি নেই যার
তার মাথায় তিনটি মুকুট পরিয়ে দেয়া হলো
আসামী, হয়ে গেলেন বিচারক!

কারণ অনেক বিকল্প থাকা সত্ত্বেও একজন দলীয় রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়া ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারিনি। তারই প্রতিক্রিয়ায় লিখেছিলাম উক্ত কবিতা।

এ ব্যাপারে চৌদ্দ দলের শর্তসাপেক্ষ সমর্থন জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশার সঞ্চার করেছিল। রাজপথে সংঘাত এড়াতে চৌদ্দ দলের এ পদক্ষেপ ছিল অভিনন্দনযোগ্য। চৌদ্দ দল আশা করেছিল রাষ্ট্রপতি তাঁর দলনিরপেক্ষতা প্রমাণ করে দেশবাসীর কাছে একজন প্রণম্য ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসে স্থান লাভ করবেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি তার ভূমিকাকে নিরপেক্ষ করে তুলতে পারেননি। চারদলীয় জোট সরকারে নেই সত্য, কিন্তু সরকারের বিকল্প হিসেবে হাওয়া ভবন হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ওখান থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ হাওয়া ভবনের সম্মতি না পাওয়ায় এখনো ঝুলে আছে। লোক দেখানো নিয়োগ-বদলি, যা করা হচ্ছে তা মোটেই অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের অনুকূল নয়। সাজানো নাটকের মতো যে সমস্ত পদ থেকে বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বদলি করে যাদের ওখানে বসানো হচ্ছে তারা জোট সরকারের দলীয় ব্যক্তি। নির্বাচন পরিচালনার জন্য জেলা, উপজেলা এবং তৃণমূল পর্যায়ে যেসব কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে, পুলিশ, সচিব এবং জেলা প্রশাসক পর্যায়ে যে সমস্ত দলীয় লোককে বসানো হয়েছে, নির্বাচনে জোট সরকারের অনুকূলে কাজ করার জন্য তারা ওই সব জায়গায় এখনো অবস্থান করছেন।

রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষ আচরণ করছেন এটা প্রমাণ করার জন্য মান্নান ভূঁইয়া মাঝে মাঝে নাটকের সংলাপের মতো এমনসব মন্তব্য করছেন, এটা যে একান্ত সাজানো ব্যাপার তা কারো উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। উপদেষ্টা পরিষদের দুজন সদস্য সুলতানা কামাল এবং শফি সামী শেখ হাসিনার বাড়ি যাওয়াকে উপলক্ষ্য করে তাদের পদত্যাগ দাবি করেছেন। আসলে রাষ্ট্রপতি তাদের পাঠিয়েছিলেন শেখ হাসিনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী সংস্কারের জন্য কিছু সময় নিতে। এ দুজন উপদেষ্টার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে ৩ নভেম্বর ২০০৬ হাসিনা পল্টনের বিশাল জনসমাবেশে আরো এক সপ্তাহের সময় দিয়েছেন রাষ্ট্রপতির নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য।

আজিজ-জাকারিয়ার পদত্যাগের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উপদেষ্টামণ্ডলী। এই সিদ্ধান্ত বানচাল করার নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে জোট সরকার। এ ব্যাপারটিকে ধোঁয়াটে করার জন্য ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সুলতানা কামাল ও শফি সামীকে দলীয় আখ্যায়িত করে তাদের অপসারণ দাবি করেছে। ২ নভেম্বর বঙ্গভবনে গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক করে উপদেষ্টা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদত্যাগের জন্য আজিজ-জাকারিয়াকে অনুরোধ জানানো হবে। বৈঠকে এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়। এতে জানানো হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হবার পর নির্বাচন কমিশনকে যদি পুনর্গঠন করা না হয়, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ অতীতের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। ৯১ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক

সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে পদত্যাগ করার অনুরোধ করেছিল। তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সুলতান হোসেন খান পদত্যাগ করলে বিচারপতি আবদুর রউফকে প্রধান করে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা হয়েছিল। একইভাবে ৯৬ সালে বিচারপতি সাদেক হোসেন সমালোচনার সম্মুখীন হন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে বিচারপতি সাদেককে পদত্যাগের অনুরোধ জানানো হয়। বিচারপতি সাদেক পদত্যাগ করলে আবু হেনাকে প্রধান করে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা হয়। এসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে উপদেষ্টা পরিষদ বিস্তারিত আলোচনার পর নির্বাচন কমিশন থেকে বিচারপতি আজিজ এবং জাকারিয়াকে পদত্যাগের অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিষয়টি দুই নেত্রীর কাছে জানানোর জন্য দুটি টিমও গঠন করা হয়। চৌদ্দ দলের দেয়া তিনদিনের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বিষয়টি শেখ হাসিনাকে অবহিত করার জন্য দুই উপদেষ্টা শফি সামী এবং সুলতানা কামাল শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার মহাসমাবেশে শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য আরো সাতদিন সময় দিয়েছেন। অপরদিকে উপদেষ্টা হাসান মশহুদ ও আজিজুর রহমানের যাওয়ার কথা ছিল খালেদা জিয়ার কাছে। কিন্তু এই দুজন উপদেষ্টা খালেদা জিয়ার কাছে সাক্ষাৎ করার সময় চাইলে তাদের সময় দেয়া হয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধূম্রজাল সৃষ্টি করার জন্য মান্নান ভূঁইয়া বলেছেন সুধা সদনে গিয়ে শফি সামী এবং সুলতানা কামাল তাদের নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য তাদের শেখ হাসিনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। একথা সাংবাদিকদের কাছে এ দুজন উপদেষ্টা জানিয়েছেন। এর ফলে তাদের নিরপেক্ষতার অভিযোগ একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অপর এক উপদেষ্টা আকবর আলী খান বলেছেন, সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে হলে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করা বা কথা বলতেই হবে। এতে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হবার কোনো কারণ নেই।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার ধারণা রাজনৈতিক দলগুলো গ্রহণ করেছিল যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে। কাজেই এ সরকারের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন যাতে সুনিশ্চিত করা যায়, তার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ। প্রথমত তিনি দলীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার। এর পরেও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেছেন এবং নিজে ১১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাঁর হাতে রেখেছেন। স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, সংস্থাপন, শিক্ষাসহ প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পদ নিজে গ্রহণ করেছেন। নির্বাচন কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্বও তাঁর হাতে। অন্যান্য উপদেষ্টাদের তিনি যে সমস্ত দায়িত্ব বণ্টন করেছেন তাতে নির্বাচন কার্যক্রমে তাদের তেমন কোনো প্রভাবই থাকবে না।

দেশ এখন গভীর সংকটের মুখোমুখি। আওয়ামী লীগসহ চৌদ্দ দল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে যে ১১ দফা বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে একদিনের মধ্যেই তা বাস্তবায়ন করতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি কতখানি আন্তরিক তা প্রমাণ হতো তিনি যদি ১১ দফা বাস্তবায়নে কিছু কিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করতেন। হয়তো হাওয়া ভবনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের কারণে তিনি ইচ্ছা থাকলেও কিছু করতে পারছেন না। এভাবে পুতুল হয়ে থাকার চেয়ে পদত্যাগ করা হবে তাঁর জন্য গৌরবের। চৌদ্দ দলের এক সপ্তাহ সময় খুব দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে। তিনি যদি এরমধ্যে সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে ১১ দফা বাস্তবায়ন করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জাতিকে উপহার দিতে পারেন, তাহলে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে, কোনো কোনো ব্যক্তি জাতির সংকটকালে সাহসের সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইতিহাসের অংশ হয়ে যান। আমরা আশা করবো রাষ্ট্রপতি ইতিহাসের নায়ক হওয়ার গৌরবের এ সুবর্ণ সুযোগটি হারাবেন না। এ কাজে যদি তিনি ব্যর্থ হন, দেশ সংঘাতের দিকে চলে যাবে। দেশব্যাপী যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে তা কেউ সামাল দিতে পারবে না। লুটপাটের মাধ্যমে জোট সরকার দেশকে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে ফেলেছে। তত্ত্বাবধায়ক

সরকারের ব্যর্থতার সুযোগে যদি দেশে রক্তক্ষয়ী সংঘাত, সংঘর্ষ দেখা দেয়– তা পুলিশ, বিডিআর, র‌্যাব কিংবা সেনা বাহিনী নামিয়েও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। দেশে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেবে– তার প্রভাব পড়বে শিল্পক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যে। বৈদেশিক বিনিয়োগও বন্ধ হয়ে যাবে। অনেকে দেশ থেকে পুঁজি সরিয়ে বিদেশে পাচার করবে।

রাজনৈতিক সংকট রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করতে হয়। অন্য পন্থায় নয়। আশা করি আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য, এর ধারাবাহিকতা যেন অক্ষুণ্ন থাকে তার উদ্দেশ্যে দেশকে অবাধ, সুষ্ঠু, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয়ার স্বার্থে যা যা করণীয় তা যেন এক সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করেন।

দৈনিক সমকাল
১২ নভেম্বর ২০০৬

গণজাগরণ ও বজ্রাহত দৈত্য

একটি গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। তখন বিভিন্ন দল তাদের নির্বাচন সংক্রান্ত মতামত ব্যক্ত করে। ওই সময়ই জনসাধারণ কান খোলা রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে।

নির্বাচন পরিচালনার মূল খুঁটি নির্বাচন কমিশন। দেশে স্বাধীন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের দলনিরপেক্ষতা এবং দক্ষতার ওপর। কমিশনের যিনি প্রধান তিনি হয়ে ওঠেন দেশের প্রধান আলোচ্য বিষয়। যেমন হয়েছেন ভারতে টিএন সেশন। তিনি সিইসি পদে আসীন হয়ে স্বাধীনভাবে কেবল নির্বাচনী দায়িত্বই পালন করেননি, রাজনৈতিক দলগুলোর বেআইনি কার্যকলাপও শক্ত হাতে বন্ধ করেছেন। বাংলাদেশে ঘটেছে ঠিক উল্টোটি। সদ্য ছুটিতে যাওয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ তার বক্তব্য, আচরণ ও কাজকর্ম দিয়ে নিজেকে বিতর্কিত করেছেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদটি সাংবিধানিক পদ। এই পদটি নিরপেক্ষ বলা হলেও তিনি তার কার্যকলাপে এই নিপেক্ষতা প্রমাণ করতে পারেননি। আদালত নতুন তালিকা প্রণয়ন করার বিপরীতে রায় দিলে সিইসি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে তার কাজ চালিয়ে যান এবং ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকার খসড়াও প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি প্রায় অর্ধ কোটি টাকা রাষ্ট্রের অপচয় করেন। এভাবে তিনি স্বৈরাচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। কেবল রাজনৈতিক দল নয়, বিভিন্ন পেশার মানুষও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

চৌদ্দ দলের সংস্কার প্রস্তাবের এক নম্বর দাবি ছিল-- সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের খাতিরে কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা। কারণ তিনি দলীয় ব্যক্তি। এম এ আজিজ এবং তার অন্য সহকর্মীদের স্ব-স্ব পদ থেকে সরিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা ছিল তাদের দ্বিতীয় প্রধান দাবি। এই দাবিতে চৌদ্দ দল দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে গণজাগরণ ঘটায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বহু জেদাজেদির পর কে এম হাসান অবশেষে সরে দাঁড়ান। এতে চৌদ্দ দলের প্রথম রাজনৈতিক বিজয় সূচিত হয়। এম এ আজিজের পদত্যাগসহ ১১ দফা দাবিতে তৃতীয় দফা অবরোধ আহ্বান করে চৌদ্দ দল। ইতোমধ্যে দলমত নির্বিশেষে তাদের এই দাবির প্রতি জনগণ সমর্থন জানায়। এই দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়। চৌদ্দ দল আহূত অবরোধ কর্মসূচিতে শরিক হয় দেশের আপামর জনগণ। এর দাবানল জেলা, উপজেলা এবং গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে পত্রিকায় দেখলাম, কোনো কারণ না দেখিয়ে তিন মাসের ছুটিতে যাচ্ছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ। তবে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, ছুটিকালীন রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা তাকে দিতে হবে। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করবে না। তিনি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবেন-- এটাই জাগণের কাছে স্বস্তির খবর।

বুধবার রাতে রাষ্ট্রপতি ইয়াউদ্দিন আহম্মেদ জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে সিইসির ছুটির কথা অবহিত করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনে দু'জন কমিশনার নিয়োগেরও ঘোষণা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সফল হবে কিনা তা নির্ভর করছে রাষ্ট্রপতির ওপর। এক্ষেত্রে উত্তম হতো উপদেষ্টা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে দু'জন নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ দেয়া। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে তাদের বা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে মনে হয় না। তিনি উপদেষ্টাদের নাকি এই বলে আশ্বস্ত করেছেন, নির্দলীয় ব্যক্তিদেরই নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করা হবে। রাষ্ট্রপতি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন আশা করি। নির্বাচন কমিশনে বর্তমানে যে তিন কমিশনার আছেন তাদের সম্পর্কে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ ও আপত্তি আছে। সেক্ষেত্রে নবনিযুক্ত দুই কমিশনারের মধ্য থেকে একজনকে সিইসির দায়িত্ব দেয়াই সমীচীন ছিল। এক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধা নেই বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরাও সেরকমটি প্রত্যাশা করেছিলেন। তাদের মতে, নির্দলীয় ব্যক্তিকে নতুন কমিশনার নিয়োগ করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে অস্থায়ী সিইসি'র দায়িত্ব দেয়া হবে ঝুঁকিমুক্তি। সিইসি এম এ আজিজের ছুটিতে রাজনৈতিক সংকট কাটবে কিনা বলা কঠিন। উপদেষ্টাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা তথা রাষ্ট্রপতির দূরত্ব বাড়ছে। এটি ভালো লক্ষণ নয়।

জনগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। গতকাল ঢাকা ও দেশের সর্বত্র অবরোধে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা গেছে। চারদিক থেকে মিছিল এসে ঢাকা শহর জনমুদ্রে পরিণত হয়েছে। চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য আরও দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে। কাজেই রক্তের বিনিময়ে ধীরে ধীরে অর্জিত এই সাফল্য অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। কোনো প্রকার হঠকারিতা যেন প্রশ্রয় না পায়। এখনও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত আছে দলীয় রাষ্ট্রপতি এবং উপদেষ্টা প্রধানের হাতে। পদে পদে সতর্ক থাকতে হবে, দুর্বলতার ফাঁক দিয়ে অপশক্তি যেন আসতে না পারে। এই বৈরী পরিবেশে আমাদের উপদেষ্টামণ্ডলী যে ধৈর্য ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে জনগণের দাবিকে নানা কৌশলে কার্যকরী করার জন্য মতৈক্যে পৌঁছেছেন, তার জন্য তারা অবশ্যই অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। আশা করা যায়, তাদের এই সুচিন্তিত কাজের দ্বারা দেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

আমাদের প্রত্যাশা, স্বাধীনতার চেতনার অনুভবে, সূর্যোদয়ের স্বপ্নে সাফল্যমণ্ডিত হবে। জানি, অন্ধকার এত সহজে দূর হয় না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়। গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হয়, যেন গণবিচ্ছিন্ন চক্র বজ্রাহত দৈত্যের মতো আর্তস্বরে ক্রন্দন করে দেশ ছেড়ে পালায়।

দৈনিক যুগান্তর
২৪ নভেম্বর ২০০৬

একতরফা নির্বাচনের পরিণাম হবে ভয়াবহ

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবেশন করার উদ্দেশ্য ছিল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তিন-তিনটি নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের পর ফলাফল নিয়ে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও আমরা লক্ষ্য করেছি। তবে শেষ পর্যন্ত সবাই ফল মেনে নিয়েছে এবং সংসদীয় ব্যবস্থায়ও ফিরে গেছে।

এবারই প্রথম নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে, আপত্তি ও সংস্কারের দাবি উঠেছে। এসব দাবির পেছনে যে অকাট্য যুক্তি ছিল সময়ের ব্যবধানে তা প্রমাণিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আগে চারদলীয় জোট ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজটি সম্পন্ন করেছে। নির্বাচন কমিশনসহ প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নিজস্ব লোক বসিয়েছে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সংস্থা। কিন্তু এম এ আজিজের মতো বিতর্কিত ও দলীয় লোক বসিয়ে তারা প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে। যে নির্বাচন কমিশন গত দেড় বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করতে পারেনি, সেই কমিশন কীভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করবে? প্রথম দফায় আদালতের আদেশ লংঘন করে তারা নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করে গর্হিত কাজ করেছে। পরে আদালত সেই তালিকা প্রণয়ন অবৈধ ঘোষণা করলে হালনাগাদের নামে একটি জগাখিচুড়ি তালিকা তৈরি করে। প্রথম থেকেই ভোটার তালিকা নিয়ে ব্যাপক আপত্তি উঠলেও নির্বাচন কমিশন পাত্তা দেয়নি। পরবর্তীকালে যখন ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা এনডিআই ভোটার তালিকায় ১ কোটি ২২ লাখ ভুয়া ভোটার আছে বলে রিপোর্ট দেয় তখনই কমিশনের টনক নড়ে। আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোর চাপে শেষ পর্যন্ত কমিশন তালিকা সংশোধনের উদ্যোগ নিলেও প্রকৃত ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত না করে দলীয় বিবেচনায় নাম কাটা হচ্ছে বলে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে।

এবার এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়। রাজনৈতিক দলগুলোও শর্তসাপেক্ষে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টা পদে মেনে নিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি তার প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তে নিজেকে বিতর্কিত করেছেন। রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে উপদেষ্টারা দুই প্রধান জোটের সঙ্গে আলোচনা করে একটি প্যাকেজ ফর্মুলা পেশ করেন। এই ফর্মুলা অনুযায়ী চৌদ্দ দল আন্দোলনের কর্মসূচি স্থগিত করবে এবং সরকারও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। নির্বাচন কমিশন থেকে বিতর্কিত মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী ও স ম জাকারিয়াকে ছুটিতে পাঠানোর সবকিছু চূড়ান্তও হয়। শেষ মুহূর্তে কোন অদৃশ্য শক্তির প্ররোচনায় তারা বেঁকে বসেন। এর আগে সিইসি এম এ আজিজের পদত্যাগের বিষয়টি চূড়ান্ত হলেও রাষ্ট্রপতি তাকে ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। আন্দোলনরত দলগুলো তাও মেনে নিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি যে চারজন উপদেষ্টাকে দুই প্রধান জোটের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা প্যাকেজ ফর্মুলা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। তাদের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক দলগুলো বঙ্গভবন ঘেরাওয়ের মতো কঠোর কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করে। সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললেও রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা না করে সেনা বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর মধ্যরাতে রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন, তাতে আন্দোলনরত দলগুলোর প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। এক ঘণ্টা আগে বিএনপি মহাসচিব সাংবাদিক সম্মেলনে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে আমরা হতবাক হয়েছি। এরপর মাননীয় চার উপদেষ্টা বিবেকের তাড়নায়ই যে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তারা বলেছেন, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভূমিকা রাখার জন্যই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যোগ দিয়েছিলেন। এখন সেই ভূমিকা রাখতে পারছেন না। অর্থ উপদেষ্টা আকবর আলী খান বলেছেন, নেহায়েত চাকরির জন্য তারা পদ আঁকড়ে থাকবেন না। এই উপদেষ্টাদের প্রশাসনিক দক্ষতা ও নৈতিকতাবোধ সন্দেহাতীত। তারা যদি কারও প্রতি দায়বদ্ধ থেকে থাকেন তা হলো ন্যায় ও সততা।

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বশর্ত সংশ্লিষ্ট সবার আস্থা অর্জন। রাষ্ট্রপতি তথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অনেক আগেই রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা হারিয়েছেন। এবার চারজন উপদেষ্টাও তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলেন। এখন যে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে এ থেকে উত্তরণের

একটি পথ, তা হলো অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের পদ থেকে রাষ্ট্রপতি ইয়াজিউদ্দিন আহম্মেদের সরে দাঁড়ানো এবং সেখানে একজন নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ পদত্যাগী ৪ উপদেষ্টার মধ্য থেকে একজনকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দেয়ার কথা বলেছেন। আমরা তার এই প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই। এর বাইরে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ যদি একতরফা নির্বাচন করার চেষ্টা করেন তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এক্ষেত্রে আমরা তাকে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের কথা স্মরণ করতে বলবো। কেবল চৌদ্দ দল নয়-- এলডিপি, জাতীয় পার্টি, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, সিপিবি, যুক্তফ্রন্টসহ দেশের অধিকাংশ দল ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সাজানো নির্বাচনে অংশ নেবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। অনিবার্য সংঘাত থেকে দেশকে বাঁচাতে আপনি এখনই পদত্যাগ করুন।

দৈনিক যুগান্তর
১৩ ডিসেম্বর ২০০৬

বিজয় মাসের ভাবনা

ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর আমি কোনো বিজয় দেখিনি। কেবলই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে দিন কাটাচ্ছি।

বিজয় মানে একখণ্ড মাটি দখল করা নয়। বিজয় শুধু নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ফসলও নয়। বাঙালি এই বিজয় অর্জন করার জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, লড়াই করেছে পাকিস্তানের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আমাদের অর্জন ছিল বিশাল। এর প্রতিটি অর্জনের পেছনে আমাদের রক্ত ঢালতে হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের ফরারফব ধহফ ৎঁষব নীতির ফলে এদেশে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ফলে এক সময় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য এবং বিভেদের সৃষ্টি হয়। এই বিভেদকে স্থায়ী করার উদ্দেশে সাম্রাজ্যবাদের উস্কানিতে দেশে বেশ কয়েকবার ছোটবড় দাঙ্গাও অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জন যখন বাংলা ভাগ করেন, তখন তার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। হাজার হাজার যুবক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কোথাও কোথাও এই আন্দোলন সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে সহিসংতা ব্যাপকতা লাভ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহা টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা করেন। ১৯৩০ সালে বিনয়-বাদল-দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন। একই বছরে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনা ঘটে। এই আন্দোলনে মুসলমানেরা যাতে অংশগ্রহণ করতে না পারে তার জন্য তখনকার দিনের মুসলমানদের এক শীর্ষনেতা নবাব সলিমুল্লাহ এবং তার কিছু সমর্থক বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে কাজ করেন। উল্লেখ্য, ঢাকার নবাব সল্লিমুল্লাহকে ব্রিটিশ সরকার ১৪ লাখ টাকা বিনা সুদে ঋণ দিয়ে বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছিল।

এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুরা। পাকিস্তানবাদীরা এই আন্দোলনকে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করে। এই আন্দোলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশপ্রেমীকেরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল বলে কেউ কেউ একে ধর্মভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেছিল। কিন্তু আসলে এটা হিন্দু ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম। তাই তখনকার দিনের মুসলমান সমাজের অসাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। মিটিং মিছিল করেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, আবুল কাশেম, আবদুল হালিম গনজবী, লিয়াকত হোসেন, আবদুস সোবহান চৌধুরী, খাজা আতিকুল্লাহ, খানবাহাদুর মোহাম্মদ ইউনুস, মজিবুর রহমান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ।

তবে একথা সত্য যে, এই আন্দোলনে মুসলমানদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। কারণ তখনকার দিনে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিল বলে তাদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবোধের চেতনা গড়ে ওঠেনি। অপরপক্ষে, ইংরেজরা বাংলাকে বিভক্ত করে ইংরেজ-বিরোধী প্রবল আন্দোলনকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছিল। কার্জনের ভাষায় হিন্দুরা নিজেদের একটা জাতি ভাবতে ভালোবাসতো এবং স্বপ্ন দেখতো ইংরেজকে বিতাড়িত করে সরকার দখল করা। বাংলা ভাগ করে কার্জন সেই বাঙালি হিন্দু আন্দোলনকারীদের দুর্বল করে দিতে চেয়েছিল প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে। ১৮৯৬ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ওল্ডহাম বলেছিলেন, মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গকে পৃথক করলে হিন্দুদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমন করা সহজ হবে। কয়েক বছর পর ফ্রেজার অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

এতেই দেখা যায়, ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি দয়াপরবশত বঙ্গ বিভাগ করেনি, করেছিল ভারতের ক্রমবিকশিত রাজনৈতিক তৎপরতাকে দুর্বল করার জন্য।

তারই ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের অর্থায়নে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মনেপ্রাণে ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী, কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে ত্রিশ দশকে হয়ে উঠলেন সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের অবিসংবাদিত নেতা। তত্ত্ব দিলেন হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি। এই দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভিত্তি করে ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৪ সালে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পাকিস্তানের

তমশায় আচ্ছন্ন আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রমুখ সাহিত্যিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বললেন, বাংলা সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি নয়। এটা হিন্দু সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি। এরা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির মুলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় রত হলেন।

অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খাজা নাজিমুদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আকরম খাঁ, আবুল হাশিম প্রমুখ মুসলিম লীগের পক্ষের অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগকে তৃণমূলে নিয়ে গেলেন। মুসলমান শিক্ষিত তরুণদের বিভ্রান্ত করতে সফল হলেন। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে পাকিস্তানের স্বপক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল এবং দাঙ্গায় নিহত লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমানের মৃতদেহের ওপর দিয়ে ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট তথাকথিত স্বাধীনতার নামে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী মনে করলেন পাকিস্তান হবে তাদের স্বর্গরাজ্য। সবার উপরে ওঠার সুযোগ হবে অবারিত। অন্ন-বস্ত্রের অভাব থাকবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দেড় বছরের মধ্যে যখন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার পল্টন ময়দানে ঘোষণা করলেন উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। তখন বাংলার মুসলমানদের যেন হঠাৎ স্বম্ভিত ফিরে আসলো। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে তারা আর নিজেদের ভবিষ্যৎকে খুঁজে পেল না। পাকিস্তানের মোট অধিবাসীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৬ শতাংশ। আর এদের সাহিত্য এবং ভাষা ছিল পাকিস্তানের যে কোনো প্রদেশের চাইতে উন্নত। জিন্নাহ সাহেব এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবিকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানে প্রথম গণতন্ত্রকে হত্যা করলেন। তারই প্রতিবাদে ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি রক্ত দিয়ে আমরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তণ করেছি।

১৯৫৪ সালে আমরা প্রাদেশিক আইন পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলাম। তখন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাদের ক্ষমতায় আসতে দেয়া হলো না। ১৯৫০ সালে এবং ১৯৬৪ সালে এদেশে আবার দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটিয়ে আমাদের বাঙালিত্বের আন্দোলনকে তারা রক্তের বন্যায় সঙিন ডুবিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চাইল। ৬৫ সালে বঙ্গবন্ধু ৬-দফা ঘোষণা দিলেন। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষায় এর জবাব দেবে বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল এবং শেখ মুজিবকে আগরতলা মামলায় প্রথম আসামী করে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নীল নক্শা তৈরি করলেন। কিন্তু জনতার গণজাগরণের ফলে এবং ৬৯-এর গণঅভুত্থানের ফলে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক এবং জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। ওই সময় ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো সংলাপের নামে আলোচনা দীর্ঘায়িত করে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ গণহত্যায় নেমে ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করল। বাংলাদেশকে একটি নরকপুরীতে পরিণত করে। আমাদের দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা নয়মাস অসম্ভব সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনল।

আমাদের সংবিধানে যে সমস্ত আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সন্নিবেশিত হয়েছিল তা কেবলমাত্র কয়েকজন বিজ্ঞ সংবিধান বিশেষজ্ঞের মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। প্রায় ৫০ বছর ধরে লড়াই করে আমরা উপলব্ধি করেছিলাম গণতন্ত্রই দেশ পরিচালনার প্রথম শর্ত।

দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সংবিধানে সংযোজন করেছিলাম। উল্লেখ্য, যে কোনো তত্ত্ব সত্য কি মিথ্যা তা প্রমাণিত হয় প্রয়োগের মধ্যদিয়ে। দ্বিজাতিতত্ত্ব যে ভ্রান্ত তা পাকিস্তানের সমরবিদেরাই প্রমাণ করে দিয়েছিল ১৯৭১ সালে পশ্চিমাংশের মুসলমানেরা পূর্বাংশের মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে সকল ধর্মকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সংখ্যালঘুরা হয়ে ওঠে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।

ধর্ম প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ বিশ্বাসের অন্তর্গত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন করে। ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনলে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে যে কঠিন সংঘাতের সৃষ্টি হয় তা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখেছি। এই উপমহাদেশেও ধর্মের কারণে যে রক্তবন্যার নদী প্রবাহিত হয়েছিল তাও কারো অজানা নেই। একারণেই আধুনিক বিশ্বে কোথাও ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা হয় না।

ভাষা সংস্কৃতির ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে তাতে সকল ধর্মের সকল শ্রেণীর, সকল গোষ্ঠীকে মেলানো সম্ভব হয় একই জাতিসত্তার ভিত্তিতে। কাজেই বাঙালি জাতিসত্তাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ আমাদের সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে।

দীর্ঘকাল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করি সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে কোনো রাষ্ট্র আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে না। এতে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়। কাজেই আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমাদের সংবিধানে সংযোজন করেছি।

দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আমরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কৃষক সমাজের ন্যায্য দাবির জন্য সংগ্রাম করেছি। তেভাগার আন্দোলন করেছি, নাচোলে কৃষক আন্দোলনে ইলামিত্র লাঞ্ছিত হয়েছেন। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরির দাবিতে আমরা বড় বড় আন্দোলন করেছি এবং স্বাধীন হলে কৃষক ও শ্রমিকের ন্যায্য দাবি পূরণ করার ওয়াদা দিয়েছি। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান দেয়ার অঙ্গীকার করেছি। একমাত্র সমাজতন্ত্রই মানুষের এই মৌলিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। তাই সমাজতন্ত্রকে আমাদের সংবিধানের একটি প্রধান অবলম্বন হিসেবে সংযোজিত করেছি।

দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আমরা অনেক অমীমাংসীত বিষয়ের মীমাংসা করেছি।। মিথ্যাতত্ত্বের কবর রচনা করে আমরা উপরোক্ত সত্যগুলো রক্তের মূল্যে অর্জন করেছি। এই অর্জনগুলোই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চেতনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর পরাজিত শক্তি সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় এবং পাকিস্তানের অর্থায়নে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এসে আমাদের এই অর্জনগুলোকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করে চলেছে। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখনো আমরা রাজপথে রক্ত ঢালছি। দেশকে স্বাধীনতা বিরোধীদের দখল থেকে মুক্তি করে স্বাধীনতার ফসলগুলো যেন জনগণ ঘরে তুলতে পারে, তার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অর্জনগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা লড়াই করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের অঙ্গীকার ছিল এদেশের মানুষের দারিদ্র দূর করব। তাদের অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাস, পুষ্টি প্রভৃতি মৌলিক দাবি পূরণ করব। ব্যক্তি, সংবাদপত্র, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগের অধিকার ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করব। অথচ স্বাধীনতাত্তোর এই দীর্ঘ সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি সাধিত হলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখনো দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে। তাদের মৌলিক অধিকার আজও সুনিশ্চিত হয়নি। পাগলা ঘোড়ার মতো জিনিসপত্রের উর্ধ্বগতিতে শুধু দরিদ্র শ্রেণী নয়, মধ্যবিত্ত ও সৎ উচ্চবিত্তদেরও নাভিশ্বাস উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে আগামী নির্বাচনে যেন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি জয়লাভ করে এবং স্বাধীনতার অর্জনগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়– এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল খেলাফত মজলিশের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিতে বলা হয়েছে সনদপ্রাপ্ত আলেমেরা ফতোয়া দেয়ার অধিকার পাবে, কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি দেয়া হবে ইত্যাদি। আমরা বিশ্বাস করি, আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড শেখ হাসিনা ও উচ্চ পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের যে কাউন্সিল আছে তারা এই চুক্তি কোনোমতেই অনুমোদন করবে না। কারণ এই চুক্তির ফলে আওয়ামী লীগের অর্ধশতাব্দীকালের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের মূলে ছুরিকাঘাত করা হবে। নারীদের মানবাধিকার অবহেলিত হবে। এই সিদ্ধান্ত শুধু মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলোকে ভূলুণ্ঠিত করবে না, সংবিধানের মূল খুঁটিসমূহ– যা বিগত সরকারগুলোর আমলে অকেজো করে দেয়া হয়েছে তার প্রতিও বিরাট আঘাত করবে।

এই ইস্যু নিয়ে যাতে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় তার জন্য এই চুক্তি আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের অনুমোদন পায়নি শীর্ষক একটি বিবৃতি প্রচার করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর এদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার ঘটে এবং দুই সামরিক শাসকের কল্যাণে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, আমাদের রাষ্ট্রের মূল আদর্শ ধরে টান দিয়েছে। প্রথম সামরিক শাসক সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ করে দেয়, দ্বিতীয় সামরিক শাসক ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে। আওয়ামী লীগসহ সকল বুদ্ধিজীবী সামরিক শাসকের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় লেখক, বুদ্ধিজীবীরা সভা-সমাবেশ করেছেন, পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন।

এবার গণজাগরণের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে, আমরা আশা করবো বিগত দুই সামরিক সরকার আমাদের সংবিধান থেকে যে সমস্ত মৌলিক নীতি– ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রত্যাহার করে এদেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবার যে অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এবং গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলো অকেজো করে দিয়েছে, এবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহা ঐক্যজোট সরকার গণতন্ত্রের সেই স্তম্ভগুলো সংবিধানে পুনঃসংযোজিত করবে।

১৫ ডিসেম্বর ২০০৬

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কখনও জাতীয় ঐক্যের সেতুবন্ধ নয়

মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক লড়াই।
দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালে বাঙালি মুসলমান জনসাধারণের ভোটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দেড় বছরের মধ্যে পাকিস্তানের জনক যখন ঘোষণা করলেন উর্দুই একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। তখনই তিনি গণতন্ত্র হত্যার প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করেন। গোটা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ছাপ্পান্ন ভাগ বাস করতো পূর্ববঙ্গে এবং এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতিও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের যেকোনো প্রদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির চেয়ে উন্নত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়া ছিল অগণতান্ত্রিক এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পরিপন্থী।
১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ক্ষমতায় আসতে না দেয়াটা ছিল গণতন্ত্র হত্যার সামিল।
১৯৭০ সালের প্রাদেশিক এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। নানা অজুহাতে সংলাপকে দীর্ঘায়িত করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে না দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানো ছিল শুধু অমানবিক নয়, এক প্রকার নৃশংসভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা। ফলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাঙালি মুসলমান তাদের ভবিষ্যৎকে আর খুঁজে পেল না। এতে প্রমাণিত হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব কত ভ্রান্ত।
ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি এবং পরস্পরের প্রতি গভীর মমত্ববোধ গড়ে তোলার পরিপন্থী এবং গণতন্ত্র বিরোধী। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান নামধারী পাকসেনারা যখন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করে তখনই সমাধি ঘটে দ্বিজাতিতত্ত্বের এবং তথাকথিত মুসলিম উম্মাহ্‌র। ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সকল ধর্মের, সকল গোষ্ঠীর, সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বড় অর্জন বাঙালি জাতীয়তাবাদ। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধীরা পেছন দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এসে আমাদের এই জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং শ্রেণী বৈষম্য দূর করার জন্য সম্পদের সুষম বণ্টনের আদর্শগুলো কলমের খোঁচায় ধ্বংস করে দেয়।
আমরা পাকিস্তানের অধীনে ছিলাম দীর্ঘ ২৩ বছর। এরই উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তান থেকে আমরা পেয়েছি বহু গণতন্ত্রবিরোধী মারাত্মক রোগ জীবাণু। এক. গণতন্ত্রের প্রতি চরম উপেক্ষা, দুই. মিথ্যাচার, তিন. মানুষকে শোষণ করার প্রবণতা, চার. সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা, পাঁচ. দুর্নীতি, ছয়. সামরিক উত্থানের প্রেরণা, সাত. ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল এবং তীব্র ভারত বিদ্বেষ। স্বাধীনতার ৩৫ বছরে বঙ্গবন্ধু ছাড়া এমন কোন ডাক্তার এদেশের ক্ষমতায় আসেননি, যিনি বা যারা আমাদের একটি জীবাণুমুক্ত স্বদেশ উপহার দিতে পেরেছেন। কাজেই আমাদের সর্বাঙ্গে এই জীবাণু রয়ে গেছে।
৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ধীরে ধীরে স্বাধীনতাবিরোধীরা নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আমাদের স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী প্রচার এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। দেশে জঙ্গিবাদের উদ্ভব ঘটে। বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যে জোট বাঁধে তাতে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এদেশে তারা ইসলামী হুকুমত কায়েম করে ছাড়বে।
তারই ধারাবাহিকতায় আজকে গণতন্ত্র ধ্বংসের মুখোমুখি। গণতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন। সরকারি ও বিরোধী দলের বিতর্কের মধ্যে দেশের শাসননীতি নির্ধারিত হয়। শাসক যদি কোনো কারণে দেশ শাসনে ব্যর্থ হয় তাহলে বিরোধী দল সরকার গঠন করার অধিকার লাভ করে। এ কারণেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলতে না দেয়ার কারণে বিরোধী দল সংসদে যোগ দিতে পারেনি। জোট সরকার এই পাঁচ বছরে এদেশের মানুষের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাস, পুষ্টি প্রভৃতি মৌলিক দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজে তারা দলীয় ব্যক্তিদের দায়িত্ব দিয়ে

দেশে দুর্নীতি ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে। পাগলা ঘোড়ার মতো জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বগতিতে শুধু দরিদ্র শ্রেণী নয়, মধ্যবিত্ত এবং সৎ উচ্চবিত্তদেরও নাভিশ্বাস উঠেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যাতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দল ক্ষমতায় যেতে না পারে তার জন্য সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিপন্থী নির্বাচনের নীলনক্সা প্রণয়ন করেছে। তাদের দলীয় ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশনের প্রধান করে এবং তাদের দলীয় রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করে এমনভাবে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব নয় বলে ১৪ দল রাজপথে নেমে দেশের গণতন্ত্রকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে যে গণজাগরণের সৃষ্টি করেছে তাতে কিছু কিছু বিজয়ের সূচনা হলেও এখনো নিরপেক্ষ নির্বাচন নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সর্বশেষ যে সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছে তা এখনো কার্যকর করা হয়নি। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ভোটার তালিকা সংশোধন, তফসিল পুনর্বিন্যাস ও বিতর্কিত সচিবদের বদলির সিদ্ধান্ত চারদলীয় জোটের জেদের ফলে এখনো ঝুলে আছে। নির্বাচন কমিশন সংস্কারের কোনো অগ্রগতি হয়নি। সচিব থেকে জেলা পর্যায়ের নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের এখনো রদবদল করা যায়নি। এনডিআই-এর প্রস্তাব মতো ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও ভুল সংশোধনের উদ্যোগ এখনো বাধাগ্রস্ত। এ প্রসঙ্গে বিএনপির হুমকিতে কাতর রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে অনীহা দেখিয়ে বলেন, এসব নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার। তারা তাদের কাজ করবে। তাদের কাজে আমাদের নাক গলানো ঠিক হবে না। সচিব রদবদল সম্পর্কে প্যাকেজ প্রস্তাব থেকে সরে এসে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমাদের যা ভালো মনে হবে তাই করবো। সবকিছু চৌদ্দ দলের কথামতো করতে হবে কেন। এতে উপদেষ্টা পরিষদের কর্মতৎপরতার ফলে যে অগ্রগতির সূচনা হয়েছিল তা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সবাই ভাবছে সংকট নিরসনে প্রধান বাধা রাষ্ট্রপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ইয়াজউদ্দিনই।

এভাবে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, সেই গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার সংগ্রামকে স্বাধীনতাবিরোধীরা পদে পদে ব্যাহত করছে। চারদলীয় জোট নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় না। কারণ নীলনক্সার নির্বাচন ছাড়া তারা মোটেও জয়ী হতে পারবে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ
বিজয় দিবস সংখ্যা ২০০৬

বিজয়ের জন্য গণজাগরণকে অব্যাহত রাখতে হবে

দেশে কি এখন কোনো সরকার আছে? তত্ত্বাবধায়ক সরকার? না, দেশে এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে চারদলীয় জোটের সরকার দেশ পরিচালনা করছে। রাষ্ট্রপতি এবং তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বিএনপি-জামায়াত সরকারের হাতের পুতুল। তারা যেমন করে নাচায় তেমনি করে তিনি নাচেন। মাঝে মাঝে এমন কথা বলেন, যাকে মিথ্যাচার বললেও অত্যুক্তি করা হয়না। তিনি বলেছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের পরামর্শ মোতাবেক দেশে সেনা বাহিনী মোতায়েন করেছেন, যা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশনের সদস্য জাকারিয়া অবিলম্বে ছুটিতে যাবেন। তিনি ছুটিতে যাননি। আরো বলেছিলেন, উপদেষ্টাদের ঐকমত্যের প্যাকেজ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু এতেও তিনি সচেষ্ট হননি। তিনি বলেছিলেন, পদত্যাগকারী চার উপদেষ্টাকে ফিরিয়ে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু চেষ্টা করা তো দূরের কথা, তিনি তড়িঘড়ি করে তাদের স্থলে তিনজন বিতর্কিত উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন। তিনি তার মধ্যরাত্রের ভাষণে চৌদ্দ দলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, একটি দাবি পূরণ হলে আরেকটি দাবি নিয়ে আসে বিরোধী দল। এভাবে তিনি বিএনপি মহাসচিব এবং বেগম খালেদা জিয়ার কণ্ঠস্বরকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করে একের পর এক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলেছেন। তিনি দলীয় রাষ্ট্রপতি ছাড়াও একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ। তার এই আচরণে দেশবাসী মাত্রই ক্ষুব্ধ এবং বিভ্রান্ত।

আন্দোলনের তীব্রতায় বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হতে অপরাগতা প্রকাশের পর ওই পদে নিয়োগ দেয়ার মতো বহু বিকল্প ব্যক্তি ছিলেন। তা তিনি অগ্রাহ্য করে বিএনপি সরকারের পরামর্শে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের পদটি নিজেই দখল করে নিয়েছেন। তাও চৌদ্দ দল মেনে নিয়েছিলো তার কাছ থেকে সুবিচার পাওয়ার আশায় এবং রাজপথে সংঘাত এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছায়। তখন লিখেছিলাম, একটি মুকুট ধারণের ক্ষমতা যার নেই, সেক্ষেত্রে তিনি তিনটি মুকুট মাথায় ধারণ করেছেন। কাজেকর্মে তিনি এই মুকুটের মর্যাদা রক্ষা করেননি।

বেগম জিয়া চৌদ্দ দলকে কটাক্ষ করে বলেছেন, সিবিএ'র মতো একটি দাবি পূরণ হলে আরেকটি দাবি তুলে চৌদ্দ দল নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল নির্বাচন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার আলোকে। নির্বাচন যাতে দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় তার জন্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব দুই প্রধান দলের সম্মতিক্রমে সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু বিদায়ী সরকার আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য এমন এক নীল নক্শা তৈরি করে, যাতে নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবক'টি প্রতিষ্ঠান তাদের দলীয় অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়। তারা বিচারপতির বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিল এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। নির্বাচন কমিশনকে তাদের প্রতি অনুগত লোকদের দিয়ে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাকে নির্দলীয় নির্বাচন কমিশন বলা যায় না। ক্রমে ক্রমে ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং অন্যান্য অপকর্মগুলো জনসাধারণের গোচরে চলে আসে। তারা সচিব পর্যায় থেকে জেলা, উপজেলা, থানা পর্যায়ে প্রতিটি স্তরে পরিকল্পিতভাবে এমনসব দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করেছে যা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই পরিস্থিতি সামনে রেখে বাধ্য হয়ে চৌদ্দ দলকে রাজপথে নামতে হয়েছে। গণজাগরণের মধ্যদিয়ে একটি বিজয় সাধিত হতে না হতেই তারা আরেকটি সংকট সৃষ্টি করে যাতে বিরোধী দল নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারে। তার জন্য বার বারই বিরোধী দলকে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে।

এমনিভাবে বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনী এবং প্রশাসনকে এমন দলীয়ভাবে সাজিয়ে রেখেছে যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্ট যে উদ্দেশ্যে সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা হয়েছে। তাদের আমলে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার সব প্রতিষ্ঠান ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করে ফেলেছে। মানুষের কোথাও কোনো ভরসার জায়গা নেই। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাদের জোটে যোগ দেবে এই আশ্বাস পেয়ে তারা একে একে তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা তুলে নেয়। যখনই দেখা গেল এরশাদের তাদের দলে যোগ দেয়ার সম্ভাবনা নেই, তখনই

বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে তড়িঘড়ি করে তাকে দুবছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। এতেই প্রমাণ হয় কিভাবে তারা আমাদের ভরসার জায়গাগুলোকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে।

দেশে যখন এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন মানুষের অধিকারগুলো ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়, গণতন্ত্রের খুঁটিগুলো যখন অকেজো করে দেয়া হয়, তখন একমাত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে মানুষের এই ভরসার জায়গাগুলো পুনরুদ্ধার করার জন্য দেশপ্রেমিক দলসমূহকে, স্বাধীনতার পক্ষের দলসমূহকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়।

এই সংগ্রামের ফলে দেশের মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দুর্ভোগ পোহাচ্ছে বলে বেগম জিয়া এবং ভূঁইয়া সাহেবরা জনগণের জন্য যতই কুম্ভীরাশ্রু ফেলুক না কেন, এই আন্দোলনের স্বপক্ষে যে জনগণের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন আছে তা বার বারই রাজপথে প্রমাণিত হয়েছে। জনগণ এটা বোঝে, সংগ্রাম ছাড়া এই লুটেরা শ্রেণীর আর্থিক লুণ্ঠন, সামাজিক এবং রাজনৈতিক নির্যাতন, অপশাসন থেকে মুক্তির বিকল্প কোনো পথ নেই।

তারা আরো বলে থাকেন, চৌদ্দ দল নাকি নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ভয়ে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এটি তাদের একটি পরিকল্পিত ধারণা। বিরোধী দল অবশ্যই নির্বাচন চায় এবং সেই নির্বাচন যাতে দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাবে নীল নক্শার নির্বাচন না হয়ে ওঠে তার জন্যই তারা প্রতিটি বাধা সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত ইয়াজউদ্দিনের মতো একজন কট্টর দলীয় ব্যক্তির অপসারণ দাবি করতে বাধ্য হয়।

আশা করা যাচ্ছে, জনগণের চাপে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে নির্বাচন করার মতো একটি অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এই নির্বাচনে চৌদ্দ দলসহ মহাজোট বিপুলভাবে জয়লাভ করবে। চারদলীয় জোটের ষড়যন্ত্রের জাল এত বিস্তৃত এবং পরিকল্পিত যে প্রতি মুহূর্তে বিরোধী দলকে সতর্ক থাকতে হবে। নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে– কখনো অবরোধ, কখনো মিছিল, কখনো পথনাটক, কখনো গণসঙ্গীত, কখনো গণসমাবেশ, কখনো-বা মহাসমাবেশের মাধ্যমে গণজাগরণকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিটি ভোট কেন্দ্র এমনভাবে ঘেরাও করে রাখতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিকল্পনা বাস্ত বায়িত করতে না পারে। সাবধান থাকতে হবে যাতে প্রতিপক্ষের হিংসাত্মক কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব বিরোধী দলের কাঁধে চাপিয়ে দিতে না পারে। যেমন দিয়েছে হাইকোর্টের ভাংচুরের ঘটনায়।

ভোটার তালিকা পূর্ণাঙ্গকরণ এবং নির্বাচনের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়ার যে সর্বশেষ দাবি মহাজোটের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, তা খুবই ন্যায্য দাবি। সংলাপ সংলাপ খেলা এবং পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে সময় হরণ করেছে, নির্বাচনের সময়সীমা না বাড়ালে বিরোধী দল নির্বাচন প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য সময় পাবে না এবং নির্বাচনও গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। আশা করি, এ দাবি গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার স্বার্থে সবাই গ্রহণ করবে।

দৈনিক সমকাল
১৯ ডিসেম্বর ২০০৬

ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগই একমাত্র বিকল্প

গত ১৩ ডিসেম্বর সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, রাজনীতিবিদরা এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেছেন, বিতর্কিত রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে সাজানো নীল নকশার নির্বাচন ঠেকাতে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করে তার অধীনে নির্বাচনে যাওয়া।

১৯৯৬ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের দলীয় ও একপক্ষীয় নির্বাচন জনগণ মেনে নেয়নি। ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনগণের আন্দোলনের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সংঘটনের জন্য সংবিধানের ৫৮ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন দল নিরপেক্ষ সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার বিধান সন্নিবেশিত করা হয়। দেশের প্রধান বিচারপতির পদটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার বিধান রাখা হয়। প্রধান বিচারপতির বিকল্প হিসেবেও বেশ কিছু সুযোগ রাখা হয়েছে সংবিধানে। কিন্তু বিগত সরকার ৯৬-এর আদলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে পছন্দের লোককে প্রধান উপদেষ্টা পদে আসীন করতে চেয়েছিল। জনগণ তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে অনেক আগেই। এই কূটকৌশলের ফলে দেশের সবচেয়ে নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য প্রধান বিচারপতিও বিতর্কিত হলেন। যা বিচার ব্যবস্থা ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে।

মাস ছয়েক আগে একটা কলামে লিখেছিলাম, প্রধান বিচারপতি, যিনি তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান হবেন, তার উচিত জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলোকে সমুন্নত রাখার জন্য এবং বিচারক ও বিচার বিভাগকে প্রশ্নমুক্ত রাখতে উক্ত পদটি গ্রহণ না করা এবং শীঘ্রই একথা ঘোষণা দেয়া। যদি তিনি ক্ষমতার লোভ ত্যাগ করে নিজেকে সংযত রাখতে পারেন, তাহলে তার সুনাম বাড়বে এবং বাড়বে সম্মান। তিনি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। কিন্তু কে এম হাসান সাহেব তত্ত্বাবধায়ক প্রধানও হতে পারলেন না। আবার দৃষ্টান্ত স্থাপনেও ব্যর্থ হলেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে তার বোঝা উচিত ছিল জনগণ বিতর্কিত কাউকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হিসেবে মেনে নেবে না। তিনি তার অপারগতার বিষয়টি যদি আরো আগে জানাতেন, তাহলে জাতি আজ এই চরম সংকটের মুখোমুখি হতো না। বিগত সরকারের আমলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তার এই কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে নিন্দিত হয়েছে।

বতর্মানে আমরা চরম দুর্দিনের মধ্যে আছি। অন্ধকারে বসবাস করছি। আমরা আবার এরশাদের শাসনামল ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের দিকে হাঁটছি। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার যে উন্মেষ ঘটেছিল তা আজ প্রশ্নবিদ্ধ, বিতর্কিত। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর জনগণ সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়কের স্থলে দলীয় তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন কতটা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রধান বিচারপতির অপারগতা প্রকাশের পর নীল নকশার নির্বাচনের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংবিধান লংঘন করে ত্বরিত গতিতে যেভাবে নিজেই তত্ত্বাবধায়কের প্রধান হলেন তা কারোরই বুঝতে অসুবিধা ছিল না। সংবিধানের তোয়াক্কা না করে প্রধান বিচারপতির বিকল্প ব্যবস্থাগুলোকে পাশ কাটিয়ে তত্ত্বাবধায়কের ওপর জনগণের যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে তা পুনরুদ্ধার করা খুবই কঠিন কাজ। সংবিধানে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক হবে নির্দলীয়। কিন্তু দলীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কিভাবে নিরপেক্ষ হবেন? আদৌ কি এটা সম্ভব?

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন নিয়ে আন্দোলন চলছে বহু আগে থেকেই। কিন্তু দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখনো পর্যন্ত এই সমস্যার সমধান করতে পারেনি। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য বিচারপতি এমএ আজিজের মতো বিতর্কিত ও দলীয় লোক বসিয়ে বিগত সরকার প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে। এমএ আজিজ আদালতের রায়কে উপেক্ষা করে ভোটার তালিকার নামে যত টাকা অপচয় করেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত ছিল জনগণের সেই টাকার হিসাব নেয়া। কারণ এই টাকা আজিজ সাহেবের সম্পত্তি নয়, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ, ভবিষ্যতে কেউ যাতে এরকম বিতর্কিত কাজ করতে সাহস না পায়। নির্বাচন কমিশন

পুনর্গঠনের নামে রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক প্রধান দলীয় লোকদের কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে বিতর্কের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দলীয় তত্ত্বাবধায়কের ষোলকলা পূর্ণ করেছেন। জনগণ তার ওপর আস্থা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হিসেবে তিনি যে মিথ্যাচার করছেন তা রাষ্ট্রপতির পবিত্র পদটিকে কলুষিত করেছে। জাতির জন্য এই মিথ্যাচার অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। একজন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এরকম মিথ্যাচার জাতি আশা করে না। সম্প্রতি তিনি তার ভাষণে সেনা মোতায়েন সম্পর্কে বলেছেন, সকল উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অথচ সেনা বাহিনী রাস্তায় নামার আগ পর্যন্ত অন্য উপদেষ্টারা বিষয়টি জানতেন না। প্রধান উপদেষ্টা একক সিদ্ধান্তে সেনা মোতায়েন করে সবার ওপর দোষ চাপিয়েছেন। উপদেষ্টাদের মতামতের মূল্য তিনি কখনোই দেননি। তাকে পেছন থেকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয় তিনি সেভাবেই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠক করাটাও লোক দেখানো ব্যাপার মাত্র। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া অন্যান্য উপদেষ্টাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। রাত নেই, দিন নেই, ঠিকমতো খাওয়া নেই, ঘুম নেই– তারা তাদের কর্তব্য পালনে চেষ্টা করেছেন শতভাগ, মিটিং করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, গভীর রাত পর্যন্ত। উপদেষ্টাদের প্রচেষ্টায় যে গুচ্ছ প্রস্তাব নিয়ে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক জোট দুটিকে নির্বাচনে মাঠে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, ইয়াজউদ্দিনের কূটকৌশলে তা ভেস্তে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদের আপ্রাণ চেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল ব্যর্থ হয়ে যায়। উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রতি প্রধান উপদেষ্টার অবহেলিত মনোভাব এবং তার অন্যায় হস্তক্ষেপে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়ে ৪ উপদেষ্টা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এই প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের পদত্যাগের ঘটনা ঘটল। পরে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাকি ৬ উপদেষ্টা পদত্যাগকারী ৪ উপদেষ্টাদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছিলেন। এতে তিনি সম্মতি দিলেও পদত্যাগকারী উপদেষ্টাদের ফিরিয়ে আনতে তিনি মোটেই আন্তরিক ছিলেন না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় এই পদত্যাগের ফলে রাষ্ট্রপতি খুশিই হয়েছেন। তার পথের সকল বাধা দূর হয়েছে। তার অনীহার কারণেই উপদেষ্টাদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের উদ্যোগ সফল হয়নি। পদত্যাগের পরেরদিন রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি আশা করেছিলেন, বঙ্গভবনে পদত্যাগকারী ৪ উপদেষ্টা তার সাথে সাক্ষাত করবেন। এজন্য রাষ্ট্রপতি দুপুর ১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বেলা সোয়া ২টায় নতুন উপদেষ্টাদের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানের পর সবার কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। পদত্যাগকারী উপদেষ্টাদের জন্য দুপুর একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বেলা সোয়া ২টায় নতুন উপদেষ্টাদের শপথ গ্রহণ করালেন কিভাবে? সোয়া ঘণ্টার মধ্যে তিন-চারজন উপদেষ্টা যোগাযোগ করে তাদের রাজি করিয়ে শপথ গ্রহণ করানো কি আদৌ সম্ভব? আসলে এর সবটাই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

প্রধান উপদেষ্টার ইচ্ছামতো অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। এটাই নিয়ম। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নতুন ৪ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া উচিত ছিল যেন সংকটের জাল আর বিস্তৃত না হয়।

রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হওয়ার পর জাতির উদ্দেশে মোট তিনবার ভাষণ দিয়েছেন। সবাই তার ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকে সুসংবাদ পাওয়ার আশায়। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি দেশবাসীকে হতাশ করেছেন। প্রতিটি ভাষণে তার কণ্ঠস্বরে ছিল খালেদা জিয়া এবং মান্নান ভূঁইয়ার বক্তব্যের প্রতিফলন। প্রতিপক্ষের ন্যায় তিনি শুধু চৌদ্দ দলকে বার বার দোষারোপ করেছেন।

বলা হয়ে থাকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী দলগুলোর অবরোধে কোটি কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু বিগত চারদলীয় সরকারের দুর্নীতির তুলনায় এই ক্ষতির পরিমাণ কিছুই না। বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বিমান, যোগাযোগসহ প্রতিটি খাতে যে দুর্নীতি হয়েছে তাকে লুটতরাজ বলাই সঙ্গত। সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন অফিস-আদালত, সচিবালয়, মন্ত্রণালয় প্রতিটি ক্ষেত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। এমনকি দুর্নীতি দমনের জন্য যে কমিশন করা হয়েছে সেখানেও দুর্নীতি বিরাজমান।

বিনামূল্যে, বিনাত্যাগে কোনো বড় অর্জন সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি অর্জনের জন্য জাতিকে অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকার করতে হয়। কখনো কখনো রক্ত দিতে হয়। যেমন ৭১-এ ত্রিশ লাখ লোকের রক্ত। আজকের পরিস্থিতি আমাদের ৭১-এর কাছাকাছি নিয়ে গেছে। তাতে জনসাধারণ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। জনসাধারণের সাময়িক অসুবিধা হয়েছে সত্য, কিন্তু গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা এই অসুবিধা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছেন। একে জনসাধারণের দুর্ভোগ বলে প্রচার করে তারাই রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায় যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য জনসাধারণের এই দুর্ভোগ এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই ত্যাগের জন্য জনসাধারণ যে চৌদ্দ দলকে দায়ী করে না তা বোঝা যায় চৌদ্দ দলের রাজপথের আন্দোলনে বৃহত্তর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে প্রচার চালালেও ব্যবসায়ীরা মনে করে নিরপেক্ষ, স্বাধীন, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য কিছুটা ত্যাগ স্বীকার অপরিহার্য। তাতে তারা ক্ষুব্ধ হন না। বরঞ্চ একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য শিল্পপতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। একপর্যায়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা এই দুর্ভোগের জন্য রাষ্ট্রপতিকে দায়ী করে বঙ্গভবন ঘেরাও করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে চৌদ্দ দল নির্বাচন কমিশনের নিকট দেড়মাস সময় চেয়েছে। দেড়মাস কেন, দেড় বছর সময়েও দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব। তাই গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিকল্প নেই। ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের অধীনে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অবশ্যই নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুনভাবে গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অন্যথায় আগামী নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ও প্রশ্নের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবে না। দেশ ও জাতি আরো গভীর সংকটের মুখোমুখি হবে। এই সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে তৃতীয় শক্তির উত্থান হতে পারে বলে অনেকে আশংকা করছেন।

এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র বিকল্প রাষ্ট্রপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ইয়াজউদ্দিন আহমদের পদত্যাগ। নতুনভাবে নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে প্রধান করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন। নির্বাচনের সময় সীমা বাড়িয়ে দিয়ে সকল দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতির জন্য সুযোগ দেয়া।

ভোরের কাগজ
২৩ ডিসেম্বর ২০০৬

আত্মসম্মান বিসর্জন

ফতোয়ার বৈধতাদান করে আওয়ামী লীগ খেলাফত মজলিস নামে একটি কট্টরপন্থী দলের সঙ্গে যে সমঝোতা চুক্তি করেছে ইতোমধ্যে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ১৪ দলের শরিক দলগুলো তো বটেই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাও এ সমঝোতা স্মারকের প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় লেখক-বুদ্ধিজীবীরাও। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, যার প্রধান ভিত্তি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এতদিন সেই আদর্শ ধারণ করতো বলে দাবি করে আসছে। একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান শক্তি তার নীতি ও আদর্শ। আমরা এই নীতি ও আদর্শের কারণেই একটি দলের সঙ্গে অপরাপর দলের পার্থক্য ও ভিন্নতা নিরূপণ করতে পারি। আওয়ামী লীগ গত অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে যে দেশের জননন্দিত ও সবচেয়ে বৃহৎ দল হিসেবে টিকে আছে তার মূলেও রয়েছে সেই নীতি ও আদর্শ। আওয়ামী লীগ স্বীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে বিএনপি বা মুসলিম লীগ থেকে তার পার্থক্য থাকে না। মনে রাখা প্রয়োজন, স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর এদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার ঘটে এবং দুই সামরিক শাসকের কল্যাণে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, আমাদের রাষ্ট্রের মৌল-আদর্শ ধরেই টান দিয়েছে। প্রথম সামরিক শাসক সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ করে দেন, দ্বিতীয় সামরিক শাসক ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেন। আওয়ামী লীগসহ সব প্রগতিশীল দলই সামরিক শাসকদের এ অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় লেখক-বুদ্ধিজীবীরাও সভা-সমাবেশ করেছেন, পত্রিকায় প্রতিবাদী লেখা লিখেছেন। একথা সত্য, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হোতা জামায়াতে ইসলামী নামের মৌলবাদী সংগঠনটি। এ দলের নেতা মওলানা আবুল আলা মওদুদী পঞ্চাশের দশকে লাহোরে কাদিয়ানিবিরোধী দাঙ্গা লাগিয়ে কয়েকশ' মানুষ হত্যা করেছে। আদালতের বিচারে তার মৃত্যুদণ্ডও হয়েছিল। পরবর্তীকালে সামরিক শাসকরা সেই দণ্ডাদেশ মওকুফ করে দেন। ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী প্রভৃতি ধর্মীয় দল কেবল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেনি, মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে হত্যার ফতোয়াও দিয়েছে। ধর্ম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। তাদের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল আলবদর-আলশামস বাহিনী যারা বিজয়ের প্রাক্কালে লেখক-শিল্পী, চিকিৎসক-প্রকৌশলী-বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। সেই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের বিচার আজও হয়নি। অথচ ঘাতকরা দেশ-বিদেশে সক্রিয় রয়েছে।

বিগত জোট সরকারের আমলে সারাদেশে যে জঙ্গিরা বোমাবাজি করে বহু মানুষ হত্যা করেছে। প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এই অপতৎপরতায় ক্ষমতাসীনদের সক্রিয় সমর্থন ছিল। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু হলেও এ সন্ত্রাসী বোমাবাজদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ বাহিনীও গড়ে তুলেছে তারা। সে সময় অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগও বোমাবাজদের বিরোধিতা করেছে। সবচেয়ে বেদানাদায়ক হলো, আওয়ামী লীগ নিজেই জঙ্গিদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শিকার হয়েছে বেশি। বঙ্গবন্ধু এভিনিউর জনসমাবেশ ছাড়াও বেশিরভাগ বোমাবাজির টার্গেট ছিল আওয়ামী লীগ। সেই বোমাবাজির রাজনীতি উৎসাহিত হতে পারে এমন কোনো কাজ করা আওয়ামী লীগের উচিত হবে না। বিএনপি তার রাজনৈতিক দর্শনের কারণেই সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের ক্ষমতার শরিক হয়েছে। আওয়ামী লীগও ক্ষমতার লোভে একই কাজ করবে সে কথা আমরা ভাবতেও পারি না।

আওয়ামী লীগ ও খেলাফত মজলিসের ৫ দফা সমঝোতা স্মারকে বলা হয়েছে, সনদপ্রাপ্ত আলেমরা ফতোয়া দেয়ার অধিকার পাবেন, কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিতে হবে ইত্যাদি।

শ্রদ্ধেয় কবীর চৌধুরী বলেছেন, আওয়ামী লীগের মতো দল এভাবে চুক্তি করতে পারে তা অবিশ্বাস্য। তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই, অবিলম্বে এই সমঝোতা স্মারক প্রত্যাহার করা হোক। ধর্ম কারো স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে না। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান শর্তই ধর্মীয় কোনো ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের ব্যাপার। এর সঙ্গে রাষ্ট্রনীতিকে জড়ানো চলবে না। অ্যাডভোকেট সুলতানা

কামালও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, যারা অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং নারী অধিকার ও গণতন্ত্রের ধারক বলে পরিচয় দেয়, তারা সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাধীনতাবিরোধীদের কাছে আত্মসম্মান বিসর্জন দিচ্ছে।

আমরা মনে করি, এটি কেবল আত্মসম্মান বিসর্জন নয়। রাষ্ট্র ও দলের আদর্শও বর্জন। এই আত্মঘাতী পথ থেকে আওয়ামী লীগকে সরে আসতে হবে।

দৈনিক যুগান্তর
১২ পৌষ ১৪১৩

সাদ্দামের ফাঁসি প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া

ইরাকে মার্কিন নীতির ব্যর্থতা প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ স্বয়ং স্বীকার করে নিয়েছেন। ইরাকে আক্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল ইরাকের জনগণ তাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবে। কিন্তু পরিণতি হয়েছে ঠিক উল্টো। অবশেষে তারা বুঝতে পারল ভিয়েতনামের মতোই এই যুদ্ধে তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। এখন খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ওখানের মহিলারা মিছিল করে শ্লোগান দিচ্ছে– ইরাক থেকে আমাদের সন্তানদের ফিরিয়ে আনো।

ইরাকে আণবিক বোমা তৈরি করা হয়েছে এরূপ একটি মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছিল। কিন্তু ইরাক যে আণবিক বোমা তৈরি করছে এ ধরনের কোনো প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি। তারপরও নির্লজ্জভাবে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছিল ধর্মরাষ্ট্র ইসরাইলের স্বার্থে এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের ওপর মার্কিন প্রভাব বজায় রাখার জন্য।

সাদ্দাম হোসেন ছিলেন ইরাকি জাতীয়তাবাদের অবিসংবাদিত নেতা এবং রাষ্ট্রনায়ক। জাতীয়তাবাদী বাথ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ইরাকের আধুনিকায়নে সাদ্দাম হোসেনের অবদান কেউ ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। তার শাসনামলে ইরাককে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য হয়তো তিনি কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন। সেই বাড়িবাড়ির জবাব দেয়ার মালিক ইরাকের জনগণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়। ইরাকের জনগণ যদি মনে করত তিনি তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছেন তাহলে তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে কিংবা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে সরাতে পারত। কিন্তু তার প্রতি ছিল ইরাকি জনগণের অবিচল আস্থা এবং প্রচণ্ড ভালোবাসা।

মিথ্যা অজুহাতে ইরাকের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, মার্কিনীদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে– চিলি, পানামা, বলিভিয়া এবং আফ্রিকার কঙ্গোতে রয়েছে এ ধরনের নগ্ন হামলার নজীর। এভাবে কঙ্গোর নেতা লুবুম্বা, চিলির আলেন্দে এবং বলিভিয়ায় চে'গুয়েভারাকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। গণতন্ত্রের প্রতি যদি তাদের সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকতো তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নগ্ন হামলা চালিয়ে ইরাকি অসহায় শিশু ও নারীসহ লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করতো না।

আত্মপক্ষ সমর্থন করার ন্যায়সঙ্গত কোনো সুযোগ না দিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে যেভাবে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে ভবিষ্যতে বিবেচিত হবে। এই ফাঁসির জন্য বিশ্ব বিবেক তাদের নিন্দা এবং ধিক্কার জানাবে। অচিরেই আমেরিকা বুঝতে পারবে জীবিত সাদ্দাম হোসেনের চেয়ে শহীদ সাদ্দাম হোসেন অনেক বেশি শক্তিশালী।

যুগান্তর এবং জনকণ্ঠ
৩১ ডিসেম্বর ২০০৬

জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আদর্শ সরকার নয়। জনপ্রতিনিধিমূলক সরকারও নয়। সাময়িক সরকার। যার প্রধান দায়িত্ব, নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য হয় তারজন্য নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য-সহায়তা ও পরামর্শ দেয়া। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নির্বাচিত মন্ত্রীদের অবর্তমানে তিনমাস তাদের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাওয়া। তারপরও দেখেছি, কোনো কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জনসাধারণ স্বস্তি বোধ করে, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে না। কারণ, তারা সব কাজ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় না গিয়ে নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। জনগণের দৈনন্দিন সংকট– গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, সার, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, যানজট প্রভৃতি সমস্যাবলী দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করে থাকেন।

এই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্প্রীতি, বোঝাপরা, বিশ্বাস এবং আস্থা না থাকার কারণে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং আস্থার অভাবে তারা একদল আরেক দলকে বিশ্বাস করতে পারে না। ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে, এটাও তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অতীতে দুটি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে উভয় দল কিছু উষ্মা প্রকাশ করলেও আন্দোলনে নামেনি। নির্বাচন পরবর্তীকালে কারচুপির অভিযোগ এনেছে। ৯৬ সালে বিএনপির প্রসহনের একতরফা নির্বাচন দেশে-বিদেশে নিন্দিত হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি তুলে ধরে। পরে উভয় দলের সম্মতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব সংবিধানে সংযোজিত হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। পরের বার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচন হয় তাকে সুষ্ঠু নির্বাচন হিসেবে আওয়ামী লীগ মেনে নিতে পারেনি। সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ তুলেছিল।

এবার রাষ্ট্রপতি অনেক বিকল্প থাকা সত্ত্বেও সকলের প্রতিবাদের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং তার অধীনে দশজন উপদেষ্টাও নিয়োগ করেন। কিন্তু উপদেষ্টাদের মতামত অগ্রাহ্য করে এমনসব সিদ্ধান্ত তিনি এককভাবে গ্রহণ করেন যার ফলে নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন দুরূহ হয়ে ওঠে। নির্বাচন কমিশনকে এমনভাবে দলীয়করণ করা হয় যে তাদের দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভোটার তালিকা ত্রুটি মুক্ত না করে এবং জোট সরকারের কট্টর সমর্থক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভোট অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ করে যে বৈরী পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় তাতে নির্দলীয়ভাবে ভোট অনুষ্ঠান আদৌ সম্পন্ন করা যাবে না জেনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চৌদ্দ দল আন্দোলনে নামে। পরে অন্যান্য দল, এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত এলডিপি এই আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করে। তার ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে মহাঐক্যজোট। এই মহাঐক্যজোটের আন্দোলনের তীব্রতার ফলে এবং ইয়াজউদ্দিনের অধীনে একতরফা নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমাজ পরিষ্কারভাবে বলে দেয়, একতরফা নির্বাচন তাদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। এই চাপের মুখে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিরোধী দল কর্তৃক আনীত সব অভিযোগ মেনে নিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে, তাকে প্রধান উপদেষ্টা রেখে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কোনোমতেই হতে পারে না। এটা তিনি তার শেষ ভাষণে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করে নেন।

দ্রুততার সঙ্গে ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে প্রধান উপদেষ্টা করে দশজন উপদেষ্টা সমন্বয়ে গঠিত হয় নতুন উপদেষ্টা পরিষদ। এই পরিষদ স্বল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত সংস্কারের কাজ করেছেন এবং যেসব কাজ হাতে নিয়েছেন তাতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণের দাবি অতীতে কোনো সরকারই কার্যকর করেনি। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইতোমধ্যে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথিকীকরণের কাজ শুরু করে দিয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীতি এবং কর্মসূচি জনগণের কাছে তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ গত ২১ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন, এরকম একটি প্রত্যয়পূর্ণ ভাষণ আগে আমরা কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের মুখ থেকে শুনিনি। কাজেই এই ভাষণকে ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে গণ্য করাই যথার্থ।

তিনি এই ভাষণের দ্বারা গোটা জাতিকে উজ্জীবিত করেছেন। সাহসের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সবচাইতে যে বিষয়টি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, তাহলো তার ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের কারণে দেশে যে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে, তিনি তার নিন্দাও করেছেন। ধর্মকে খাটো না করেও তিনি ইসলামের নামে দেশে একশ্রেণীর রাজনীতিবিদেরা যে সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব প্রচার করে, তিনি তারও প্রচ্ছন্ন সমালোচনা করেন। ইসলামের নামে ধর্মীয় উত্তেজনার বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে মুক্তচিন্তার প্রসার দরকার তা তিনি বিশ্বাস করেন। সে কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ধর্মের ভিত্তিতে জাতিকে বিভাজনের অশুভ রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে দেশকে দুর্নীতির করালগ্রাস থেকে মুক্ত করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে যা যা প্রয়োজন তা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমার সবচাইতে ভালো লেগেছে, প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের আয়ের উৎস, সমুদয় সম্পত্তি ও অর্থ উপার্জনের বিশদ বিবরণ দাখিল করা বাধ্যতামূলক করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এতে কালো টাকার মালিকদের নির্বাচনে অংশ নেয়ার পথ কণ্টকিত হয়ে উঠবে। যোগ্য, মেধাবী এবং সৎ প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি গডফাদার, দাগী অপরাধী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, সমাজবিরোধী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেবেন বলেও ভাষণে উল্লেখ করেছেন। আবার এও বলেছেন, যেন কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানির সম্মুখীন না হয় তাও সরকার দেখবেন। আমরা তাঁর কথা ও কাজের সমন্বয় দেখতে চাই।

স্বল্পতম সময়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের যে ওয়াদা তিনি করেছেন তাতে সকল রাজনৈতিক দল উল্লসিত এবং জনগণ আনন্দিত। দেশকে আবর্জনা মুক্ত করার যে সমস্ত অঙ্গীকার তার ভাষণে ফুটে উঠেছে, তাতে কোনো একটি জোটের প্রতিনিধি প্রচ্ছন্নভাবে বলেছেন, এসব কাজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায় পড়ে না। তিনি ড. ফখরুদ্দীনের এই উদ্যোগকে অনধিকার প্রবেশ বলে উল্লেখ করেছেন। একেই বলে চোরের মায়ের বড় গলা!

ড. ফখরুদ্দীন দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন। তখন তিনি ব্যাংকিং খাতকে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক করে গড়ে তুলেছিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ঋণখেলাপীদের আতঙ্ক হয়ে উঠেছিলেন। ঋণখেলাপীদের বিরুদ্ধে তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তাতে ঋণখেলাপী নামটি সামাজিকভাবে নিন্দিত হতে শুরু করে। এর দ্বারা ঋণখেলাপীদের বিরুদ্ধে তিনি একটি সামাজিক চাপেরও সৃষ্টি করেছিলেন।

তার ওপর জনগণের গভীর আস্থা আছে। ইতোমধ্যে তার কাজের দ্বারা তিনি নন্দিত হয়েছেন। যে যাই বলুক আমি মনে করি, যে প্রত্যয় নিয়ে তিনি রাজনীতিকে আবর্জনা মুক্ত করার কাজ হাতে দিয়েছেন, তাতে উত্তীর্ণ হতে হলে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে আস্থায় নিতে হবে। যে কোনো সাহসী পদক্ষেপ কার্যকর করে তুলতে হলে জনগণকে সংগঠিত করতে হয়। এ কাজটি যদি তিনি স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে আস্থায় নিয়ে করতে পারেন, তাহলে তার বক্তৃতায় তিনি যে স্বপ্নের দেশের উল্লেখ করেছেন, তা সব পেয়েছির দেশ না হলেও দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আমরা অতীতে দেখেছি বিভিন্ন সময়ে যারা ক্ষমতায় আসে তারা প্রথমে খুব ভালো ভালো কথা বলে। পরবর্তীকালে সে ওয়াদা তারা রক্ষা করে না। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে– 'প্রথম রাতে না বধিলে বিড়াল পরবর্তীতে তাকে বধ করা সম্ভব হয় না'। আমরা এও দেখেছি কোনো কোনো সরকার ক্ষমতায় এসে চোর ধরার নামে বেশ কিছু লোককে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে আইনের ফাঁক দিয়ে তারা বেরিয়ে যায় এবং সমাজে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে। এটা যাতে না হয়, তারজন্য যাদের দুর্নীতির অভিযোগে ধরা হবে তাদের যেন আটগাট বেঁধে ধরা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ, কাগজপত্র, বিজ্ঞ আইনজীবীদের পরামর্শ মতে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তারা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। এই ঐতিহাসিক, সাহসী ভাষণের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাই।

দৈনিক যুগান্তর, ২৫ জানুয়ারি ২০০৭

বিলম্ব হোক তবুও স্বচ্ছতা চাই

বিরোধী দল যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে তার জন্য অনেকগুলো গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল জোট সরকার। একটি গর্ত পার হতে না হতে তারা আরেকটি গর্তের সম্মুখীন হয়। সেই গর্ত অতিক্রম করতে না করতেই বিরোধী দলের সামনে এসে পড়ে আরেকটি গর্ত। কিন্তু অসম্ভব ধৈর্য এবং সহনশীলতা নিয়ে মহাঐক্যজোট এক একটি গর্ত অতিক্রম করেছে। বলা বাহুল্য, এই গর্তগুলো তৈরি করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাদেরই নির্দেশে দলীয় রাষ্ট্রপতি, যিনি অনেকগুলো বিকল্প থাকা সত্ত্বেও নিজেই প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত চৌদ্দ দল সংগ্রাম করেছে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত হয় মহাঐক্যজোট। এই জোটের তীব্র আন্দোলনের মুখে এবং বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের চাপে অবশেষে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ পদত্যাগ করলেন ১১ জানুয়ারি, ২০০৭। পদত্যাগের সাথে সাথে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে মধ্যরাতে তিনি জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন তাকে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি নির্মম দলিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ভাষণে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে নির্দলীয় নির্বাচন করতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করে বলেছেন, এখনো পর্যন্ত সঠিক ভোটার তালিকা তৈরি হয়নি। নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ব্যক্তিরাও পদত্যাগ করেননি। দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রাজনৈতিক দলসমূহ দুটি জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দুটি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। তিনি তার ব্যর্থতা স্বীকার করে এও বলেছেন, তার সরকারের সবকটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সকল রাজনৈতিক দল কর্তৃক সমাদৃত হয়নি। এই ব্যর্থতার কারণে যে সময়ক্ষেপন করা হয়েছে সেই প্রেক্ষিতে ৯০ দিনের সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেছেন, আপামর জনগণের প্রত্যাশা একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে যারা জয়ী হবে তাদের দ্বারা দেশ পরিচালিত হোক। কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, অনাচার, অব্যবস্থাপনা, অসহিষ্ণুতা ও সীমাহীন দুর্নীতির কারণে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ ও শান্তি নির্বাসিত।

তিনি একজন দলীয় ব্যক্তি এবং এই বিতর্কিত ব্যক্তির অধীনে যে একটি নিদর্লীয় নির্বাচন হতে পারে না এটা দেরিতে হলেও তিনি তা উপলব্ধি করেছেন। উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান হওয়া তার জন্য যে একটি নীতিহীন কাজ তাও মানতে তিনি বাধ্য হয়েছেন।

এই সত্য স্বীকার করে পদত্যাগ করতে তিনি কেন এত দেরি করলেন। যার কারণে অনেকগুলো লোকের জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। দেশের ধন-সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এর দায়-দায়িত্ব তাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। বহুদিন ধরে মহাঐক্যজোটের তরফ থেকে বিগত জোট সরকারের দলীয়করণ নীতির সমালোচনা হয়ে আসছিল। যেসব ত্রুটির কথা তিনি অবশেষে স্বীকার করলেন, সবগুলো ত্রুটি একটির পর একটি চৌদ্দ দলীয় জোটের তরফ থেকে সনাক্ত করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন সময়ে এই ব্যাপারে তাকে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিরোধী দল মন্দের ভালো হিসেবে মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাও তিনি কার্যকর করেননি। যারজন্য চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেছিলেন। ফলে তার পদত্যাগের একদফা দাবিতে আন্দোলন চরমে পৌঁছে। অবশেষে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এটা দেশবাসীর জন্য একটি সুখবর। কিন্তু তার জন্য এটা ছিল একটি অবমাননাকর সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত আগে নিলে তিনি একজন মর্যাদাবান রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃতি পেতেন। সময়ক্ষেপন করে দেরি করায় তিনি সে মর্যাদার অধিকারী হতে পারলেন না।

তাকে সাক্ষীগোপাল হিসেবে ব্যবহার করে বিগত জোট সরকার একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়ে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে একটি রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার সরকার গঠনের নীল নকশা তৈরি করেছিল। যাতে তাদের দুর্নীতিমূলক অপশাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়। তারা জানে, বিগত পাঁচ বছরে অপশাসন, দলীয় শাসন, দুর্নীতিমূলক শাসন চালিয়ে যেভাবে তারা কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে নির্বাচনে পরাজিত হলে এর

জবাবদিহিতা করতে হবে তাদের। দুর্নীতির জন্য তারা জনরোষে পতিত হবেন। তাদের এজন্য চরম শাস্তিও ভোগ করতে হবে। যার জন্য তারা বার বার এমন সব সংকটের সৃষ্টি করেছিল যাতে মহাঐক্যজোটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে এবং তারা একতরফাভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সরকার গঠন করতে পারে। এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তারা দলীয় রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আমাদের মহান সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের এই অনৈতিক আহ্বানে আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী সাড়া দেয়নি।

প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং তাঁর অপকর্মের স্বীকৃতি মহাঐক্যজোটের জন্য একটি মহাবিজয়। এ বিজয় অর্জনের জন্য বিশাল কর্মীবাহিনী রাজপথে লাঞ্ছিত হয়েছে, রক্ত দিয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে অনেকে।

ইউরোপে জার্মানির নাজিনেতা হিটলার, ইতালির ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনি এবং স্পেনের ফ্রাঙ্কোর উত্থান যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন কমরেড ডিমিট্রভ তার ইউনাইটেড ফ্রন্ট নামের একটি থিসিস প্রণয়ন করেছিলেন। সেখানে তিনি ইউরোপের ফ্যাসিবাদকে রুখবার জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দল কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ফ্যাসিবাদকে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হওয়ায় হিটলার-মুসোলিনি এতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

পরবর্তীতে এই অভিজ্ঞতার আলোকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বৈরাচারী শাসকদের উচ্ছেদ করার জন্য ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্টের নীতি অনুসরণ করেছে এবং সাফল্য লাভও করেছে।

১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের অত্যাচার-নিপীড়ন এবং দুঃশাসনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য মওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগকে স্বরণে রেখে একুশ-দফা কর্মসূচি প্রণীত হয়েছিল। এর ফলে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করে পাকিস্তানের জন্মদাতা মুসলিম লীগ। কিন্তু এই বিজয় কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের কারণে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। উল্লেখ্য, যুক্তফ্রন্টের শরিক দলে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং একমাত্র অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পার্টি গণতন্ত্রী দল। কমিউনিস্ট পার্টিকে এর অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করেছিল নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মওলানা আতাহার আলী। যার ফলে যুক্তফ্রন্টের প্রধান স্রষ্টা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি হওয়া সত্ত্বেও ঞড় ফড় ধ মৎবধঃ ৎরমযঃ/ উড় ধ ষরঃঃষব ৎিড়হম/ অহফ পঁৎন ঃযব ফবারষ ড়ভ রঃং রিষষ –এই নীতিকে সামনে রেখে যুক্তফ্রন্টের শরিক না হয়ে আলাদাভাবে অল্প সংখ্যক আসনে নির্বাচন করেছিল এবং তাতে জয়ীও হয়েছিল।

বর্তমানে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে মহাঐক্যজোট গঠিত হয়েছে তার সাফল্য এবং বিজয় ইতোমধ্যেই জনগণ উপলব্ধি করেছে। নির্বাচনে এই জোটকে বিজয়ী করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। মহাঐক্যজোটের কাছে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছে মানুষের প্রত্যাশার অন্ত নেই। সব প্রত্যাশা যে তারা পূরণ করতে পারবেন তাও নয়। কিন্তু সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভগুলো (ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ) যা বিগত দুটি সামরিক সরকার উৎখাত করেছে তা যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এছাড়া বিগত সরকার গণতন্ত্রের যে সমস্ত স্তম্ভগুলোকে (স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, নিরপেক্ষ প্রশাসন, নিরপেক্ষ পাবলিক সার্ভিস কমিশন) দলীয়করণের মাধ্যমে অকেজো করে দিয়েছে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো সমস্যা কিংবা সংকটের সৃষ্টি না হয়। বলা প্রয়োজন, যুক্তফ্রন্ট (জোট) কোনো আদর্শের ভিত্তিতে গঠন করা হয় না। গঠন করা হয় কর্মসূচির ভিত্তিতে। জনগণ আশা করে, নির্বাচনের আগে মহাঐক্যজোট একুশ-দফার মতো এমন একটি কর্মসূচি পেশ করবে যা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জীবিত করে। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি– অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আবাসন, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।

মহাঐক্যজোট গঠনের ব্যাপারে শেখ হাসিনাকে গভীরভাবে অভিনন্দন জানাতে চাই এজন্য যে তিনি এ ব্যাপারে একশ' ভাগ সাফল্য অর্জন করেছেন। বিভিন্ন দলের এবং মতের লোককে ঐক্যবদ্ধ করা খুবই কঠিন

কাজ। তিনি নানা দলের নানা মতকে কাছে টেনে এনে তার গর্বিত পিতার মতো জনগণের ঐক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ৭০ সালে বঙ্গবন্ধু ছয়-দফার ভিত্তিতে এদেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। ফলে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। ৭১ সালেও তিনি এদেশের বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন গোষ্ঠীর, বিভিন্ন পেশার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন বলে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হয়েছিল। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে তিনি দেশের দুর্নীতি-পরায়ণ, স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য শেষ পর্যন্ত এদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেন, তা ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। নানা প্ররোচণা ও প্রলোভনের মুখে এই ঐক্য ধরে রাখার দায়িত্বও শেখ হাসিনার। একথা তিনি যেন মনে রাখেন।

ফখরুদ্দীন আহমদকে উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান করে বর্তমানে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে, তাকে মহাঐক্যজোটের বিজয় বলাই সঙ্গত। নতুন উপদেষ্টা পরিষদ এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত কাজ করেছেন এবং যে সমস্ত কাজ হাতে নিয়েছেন তা জনগণের সমর্থন লাভ করেছে। বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণের কাজ তারা ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। কালো টাকার মালিক এবং সন্ত্রাসীদের উচ্ছেদ করার কাজও হাতে নিয়েছেন। এই অভিযানে যেন কোনো নিরপরাধ লোককে ধরা না হয় সেদিকে আশা করি তারা লক্ষ্য রাখবেন। নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যে সমস্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করবেন তারাও যেন কোনো দলীয় না হয় সে ব্যবস্থাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিচ্ছেন বলে শুনেছি। নির্বাচন কমিশন এখনো পুনর্গঠন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত কর্মকর্তারা যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তাহলে সাংবিধানিক একটি সংকট সৃষ্টি হবে। তিনি আশা করেন এরা দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অচিরেই পদত্যাগ করবেন। এ সংকট কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মহাঐক্যজোটের প্রধান দাবি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন। ত্রুটি মুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন। নির্বাচনে আইডি কার্ড ও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহারের দাবিও তারা করেছেন। এ দাবিগুলো পূরণ না হলে আবারো সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই দাবিগুলো পূরণ করা দরকার। এতে যদি সময় একটু বেশিও লাগে তাতেও জনগণের কোনো আপত্তি থাকবে বলে মনে হয় না।

সমকাল
২২ জানুয়ারি ২০০৭

ঘোড়া আগে না গাড়ি আগে

আমি আগেও কয়েকবার লিখেছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আদর্শ সরকার নয়। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার নয়। দেশের দুই প্রধান দলের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস এক চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তারা ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সততায় অবিশ্বাসী হয়ে ওঠার কারণে উভয় দল একমতে আসে যে নির্বাচন হবে অন্তবর্তীকালীন তিনমাস মেয়াদী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তার প্রধান কাজ নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ গ্রহণযোগ্য হয় তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য সহায়তা ও পরামর্শ দেয়া। নির্বাচিত সরকারের অবর্তমানে শাসনকার্য পরিচালনা করা। বিগত জোট সরকার বিদায় নেয়ার কালে দেশের রাষ্ট্রপতি নিজেকে প্রধান করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন তা জোট সরকার ছাড়া আর কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এনিয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। কখনো সংলাপের নামে, কখনো নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের নামে। কখনো ভোটার তালিকা হালনাগাদ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মতান্তরের কারণে। বিগত জোট সরকারের ইঙ্গিতে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নানা অজুহাতে দীর্ঘ সময় হরণ করেন। শেষ পর্যন্ত মহাজোট প্যাকেজ প্রস্তাবে রাজিও হয়েছিল। কিন্তু তাও তিনি আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করেননি। পরবর্তীতে জোট সরকার ছাড়া দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল, জোট, মহাজোট একযোগে তার পদত্যাগ দাবি করে রাজপথে নামে। হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধের মাধ্যমে দেশে এক হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ফলে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সকল দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে তত্ত্বাবধায়কের প্রধান পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। এ দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ২১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন এরকম একটি প্রত্যয়পূর্ণ ভাষণ আগে আমরা কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের মুখ থেকে শুনিনি। কাজেই এই ভাষণকে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবেই গণ্য করা যথার্থ। এছাড়া পয়লা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীতে একুশের শহীদ ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ন্যায়ভিত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে দেশবাসীর কাছে সহযোগিতা চেয়ে যে ভাষণ দিয়েছেন তাও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ।

বর্তমান সরকার কি আসলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার? হ্যাঁ, না। 'হ্যাঁ' এই কারণে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে মূল দায়িত্ব গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করা তা এই সরকার গ্রহণ করছেন। 'না' এই জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব ছাড়াও তারা দেশের দীর্ঘকালের জমা করা জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমে ক্রমে যেই আবর্জনা জমে জমে গণতন্ত্রের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করে আসছিল তারা গণতন্ত্রের পথকে প্রশস্ত করার জন্য সে বাধা-বিঘ্নগুলো অতিক্রম করার কথা বার বার বলছেন এবং সে বাধাগুলো অপসারণ করার জন্য কাজেও নেমেছেন। কাজেই এই সরকারকে শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার আখ্যা দেয়া কি সঠিক? তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতা বহির্ভূত এমন অনেক কাজ হাতে নিয়েছেন যাকে বিপ্লবী কর্মসূচি বলাই সঙ্গত।

তাহলে এই সরকার কি একটি বিপ্লবী সরকার? না, হ্যাঁ। রাজনৈতিক বিপ্লবী কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে, আন্দোলন-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যারা ক্ষমতায় আসেন এবং দেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করেন, সেই সরকারকেই বলা হয় বৈপ্লবিক সরকার। কিন্তু বর্তমান সরকার কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি। তবে বিগত জোট সরকারের বিরুদ্ধে, সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে, দুর্নীতি, কালো টাকা এবং পেশী শক্তির বিরুদ্ধে মহাজোট যে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি করেছিল তারই অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগকারী (নবহরভরপরধৎু) বর্তমান সরকার। এই সরকার বিপ্লবী সরকার কি-না তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু যে বিপ্লবী কর্মসূচি তারা হাতে নিয়েছেন এনিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। এই কর্মসূচি লুটেরা শ্রেণীকে সবলে আঘাত করছে। তাদের দুর্গ ভেঙে দিচ্ছে। জনসমক্ষে তাদের মুখোশ উন্মোচিত করে দিচ্ছে।

২২ জানুয়ারির নির্বাচনে যদি জোট সরকার ক্ষমতায় আসতো। তাহলে তারা এই বিপ্লবী কর্মসূচি নেয়া তো দূরের কথা দুর্নীতি এবং অপশাসনের মাধ্যমে দেশকে আরো রসাতলে নিয়ে যেত। আর এদের বদলে

যদি মহাজোটও ক্ষমতায় আসতো তাহলে কি বর্তমান সরকার যে সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, এ রকম সংস্কার সাহসের সঙ্গে রূপায়িত করতে পারতো? সরষের মধ্যে ভূত থাকলে তা তাড়ানো সহজ হয় না।

এই সরকার ইতোমধ্যে আইনের শাসন কায়েম করার জন্য বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ন্যায়বিচারের প্রধান শর্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচারকদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতা। এর ভিত্তিতে বিচার বিভাগকে যদি এই সরকার পুনর্গঠন করতে সফল হয় তাহলে দেশে ন্যায়ভিত্তিক আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

বর্তমান সরকার নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন। যাদের নিয়ে বর্তমান নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে, তাদের প্রতি সকল দল ও মতের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং সমর্থন রয়েছে। এই নির্বাচন কমিশন যাতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, নিরপেক্ষভাবে ভবিষ্যতেও কাজ করতে পারে তার জন্য বর্তমান সরকার বিধিমালা তৈরি করছে। ভোটার আইডি কার্ড এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে শুনেছি। নতুনভাবে ভোটার তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্তও নির্বাচন কমিশন নিয়েছে।

সবচাইতে তাদের সাহসীপূর্ণ কাজ হচ্ছে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন এবং তাতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দান। ইতোমধ্যে দল-মত নির্বিশেষে অনেক দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই অভিযান অব্যাহত রেখেছে। তবে এর পেছনে আইনি সমর্থন না থাকলে এবং দোষী ব্যক্তিদের দোষ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য ও প্রমাণাদি যদি না থাকে তাহলে এদের আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। বর্তমান সরকারের নেয়া সাহসী পদক্ষেপও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে। দুর্নীতিবাজ এসব ঘৃণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনমনে বিশাল ক্ষোভ রয়েছে। তাই এ ব্যাপারে জনগণ বর্তমান সরকারকে দ্বিধাহীন সমর্থন দিচ্ছে। জনগণের এই সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে তারা যদি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে না পারে, তাহলে জাতি আবার হতাশায় নিমজ্জিত হবে। জনমনে ক্ষোভ, এখনো কেন শীর্ষ দুর্নীতিবাজদের ধরা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে আইন উপদেষ্টার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে আমার মনে হয়।

দুর্নীতির মনোভাব নিয়ে কেউ জন্মায় না। মন্দ-সমাজ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি প্রসার লাভ করে। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এমন সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যাতে সমাজে দুর্নীতিবাজেরা নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়। তাদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান এবং আত্মীয়তার বন্ধনেও জড়িত হতে যেন জনসাধারণ আগ্রহী না হয়। আমাদের দেশে একদিন এমন ঐতিহ্য ছিল যখন এদেশের সৎ মানুষ– সুদখোর, ঘুষখোর, দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের সঙ্গে কোনো ধরনের আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত হওয়াকে অপমানজনক কাজ হিসেবে বিবেচনা করতো। দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতো। শিল্প, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত এবং প্রচার মাধ্যমকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে আমাদের সেই পুরাতন মূল্যবোধ সমাজে ফিরে আসে।

দেশের প্রশাসনকে বহুদিন ধরে দলীয়করণ করার ফলে প্রশাসনের মান অত্যন্ত নিচে নেমে এসেছে। প্রশাসন দুর্নীতির আঁখড়ায় পরিণত হয়েছে। মেধা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া হয় না। এমনকি শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়ার রেওয়াজ বহুদিন ধরে চলে আসছে। মেধা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং বিধানসম্মতভাবে শাসনকার্য পরিচালনার যে ট্রেডিশন পাকিস্তান আমলেও ছিল, তা বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। এজন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ, সৎ এবং মেধাবী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করতে হবে যাতে মেধা ও যোগ্যতা প্রধান্য পায়।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। সরকারকে এদিকেও মনোযোগ দিতে হবে। যাতে অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী এবং মানবিকবোধে অগ্রগণ্য ঐতিহ্যভিত্তিক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা যায়। এই ব্যবস্থার জন্য মেধাবী এবং যোগ্য শিক্ষক প্রয়োজন। এ ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা আমাদের খুবই কম। কারণ দীর্ঘকাল ধরে মেধার ভিত্তিতে নয়, ঘুষ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ শিক্ষক সৃষ্টি করার স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, এই মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আমরা ৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। অথচ অফিস আদালতে এমনকি বিদ্যালয়সমূহেও বিশুদ্ধ উচ্চারণে প্রমিত বানানে সুসংগঠিতভাবে আমরা এখনো বাংলা প্রচলন করতে পারিনি। যার ফলে ইংরেজিতে যেমন আমাদের পারদর্শিতা নেই। তেমনি বাংলাতেও

পারদর্শিতা অর্জন করতে পারিনি। শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন না আসলে কোনো সংস্কারই দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এই ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের অঙ্গীকার প্রণিধানযোগ্য।

এই ধরনের বহু সংস্কারের কাজ বর্তমান সরকারকে হাতে নিতে হবে। তাতে যদি নির্বাচন কিছুটা বিলম্বিত হয়, তাও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। সবকিছু করতে হবে ন্যায়-বিচারের ভিত্তিতে। যে কোনো বৈপ্লবিক কাজে সফলতা লাভ করতে হলে প্রথম দরকার জনগণের সমর্থন। সংস্কার কাজকে সর্বব্যাপী করতে গিয়ে যদি সরকার সবকিছুতে একসঙ্গে হাত দেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ধাপে ধাপে অগ্রসর না হন তাহলে কায়েমী স্বার্থবাদী এবং দুর্নীতিতে লিপ্ত লোকের প্ররোচনায় তাদের বিরুদ্ধে মুখরোচক সমালোচনা শুরু হবে। বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাতে গিয়ে সব সময় প্রতি বিপ্লবী এবং অতি বিপ্লবী শক্তিকে দৃষ্টির মধ্যে রাখতে হবে।

কিছু কিছু রাজনৈতিক দল দ্রুত নির্বাচন চায়। আবার কিছু কিছু রাজনৈতিক দল চায় সমস্ত জঞ্জাল অপসারণের পর নির্বাচন। নির্বাচনপন্থী দলগুলোর চাপের মধ্যে সরকারের অবস্থান। কাজেই এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে রাজনৈতিক দলগুলো মনে না করে, এই অনির্বাচিত সরকার স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকতে চান। এজন্য নির্বাচনের একটি সময়সীমা ঘোষণা করে রাজনৈতিক দলগুলোকে আশ্বস্ত করতে হবে।

পরিশেষে একথা বলতে চাই, তাদের সমস্ত কাজের পেছনের প্রেরণা যেন একুশের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত থাকে। ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর দিয়েছি। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতাকে আমরা সংবিধানে স্থান দিয়েছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ একুশ এবং মুক্তিযুদ্ধের মহৎ অর্জন। সে কারণে স্বাধীনতার পর পর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আমরা ইতিহাসে দেখেছি, রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করা হলে এর পরিণতি কি ভয়াবহ হয়। আমরা চাইব বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে সচেতন থাকবে।

বর্তমান সরকারের সাফল্যের চাবিকাঠি জনগণের হাতে। জনগণের বড় অংশ কৃষক, শ্রমিক, ছোট ছোট দোকানদার, ফেরিওয়ালা, হকার, বস্তিবাসী এবং নিব মধ্যবিত্ত শ্রেণী। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য তারা দুঃসহ জীবনযাপন করছে। অবিলম্বে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। শত কষ্ট, দারিদ্র্য এবং সংকটের মধ্যে বাস করেও দেশের এই মঙ্গলকামী জনগণ বর্তমান সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের সমস্যার দিকে অচিরেই যদি সরকার মনোযোগ না দেন তাহলে ধীরে ধীরে তারা এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থন হারাবেন।

স্বাধীনতার ফসল– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, পুষ্টি এবং দেশের সম্পদ বিত্তশালীরা দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করে আসছে। কখনো দুর্নীতির মধ্যেমে, কখনো নীতিহীনতার মাধ্যমে, কখনো শ্রেণী শোষণের মাধ্যমে, কখনো পারিবারিক মর্যাদার নামে। জনগণকে আমরা ভাত-কাপড়ের আশ্বাস দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্ত করেছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতার পরে দরিদ্র জনসাধারণ স্বাধীনতার কোনো ফল ভোগ করতে পারেনি। এই কথা মনে রেখে বর্তমান সরকার যদি এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন, তাহলে এদেশ সব পেয়েছির দেশ না হলেও দুর্নীতিমুক্ত এবং ক্ষুধামুক্ত একটি সুন্দর দেশ হয়ে উঠতে পারবে। আমাদের সম্পদের অভাব নেই। প্রয়োজন সদিচ্ছার। আমাদের মাটির উপরে যেমন, তেমনি মাটির নিচেও রয়েছে অফুরন্ত ধনভাণ্ডার।

দৈনিক সমকাল
১১ মার্চ ২০০৭

দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সামাজিক আন্দোলন

কিছুদিন আগে বর্তমান সরকারকে সমর্থন জানিয়ে এবং এই সরকারের কার্যকলাপের প্রশংসা করে লিখেছিলাম, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে কিছু আলোর রেখা প্রস্ফুটিত হয়েছে। উৎকণ্ঠিত কিংবা উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণগুলো ধীরে ধীরে অপসারিত হতে শুরু করেছে। বর্তমান সরকার প্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদ তার প্রায় ভাষণে বলে থাকেন ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় এবং স্বাধীনতার চেতনায় একটি সুন্দর সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার প্রত্যয় তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা থেকে জঞ্জাল মুক্ত করার এই প্রচেষ্টাকে সকলের সহযোগিতা করা উচিত বলে লিখেছিলাম। এখনই সময় আমাদের গণতান্ত্রিক পথের সকল বাধাগুলোকে অতিক্রম করার। সকল নাগরিকের বাঁচার ন্যূনতম মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করার। বিগত সরকার গণতন্ত্রের যে খুঁটিগুলোকে যেমন বিচার ব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অপশাসন, দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অকেজো করে দিয়েছে সেই খুঁটিগুলোকে মজবুত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তমান সরকারের। কারণ গণতন্ত্রের পথ কণ্টকাকীর্ণ রেখে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ হতে পারে না। এর জন্য যদি নির্বাচন বিলম্বিত হয়, তাতে জনসাধারণের কোনো আপত্তি থাকবে বলে মনে হয় না।

ইতোমধ্যে সেনা প্রধান বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতির জনক হিসেবে যে ঘোষণা দিয়েছেন তাতে দেশবাসী মাত্রই আনন্দিত হয়েছে। তারা মনে করছে এই সরকার স্বাধীনতার পক্ষের সরকার। তিনি যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকারদের বিচার করার পক্ষে যে দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেছেন তাতে আবার প্রমাণিত হলো এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল।

দুর্নীতি দমন কমিশনে লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে যে কমিশন গঠন করা হয়েছে, তাতে এই কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। হাসান মশহুদ চৌধুরী বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিবেকবান মানুষ। ওই সময় তিনি স্পষ্টবাদীতায় এবং রাষ্ট্রপতির অন্যায় আচরনের বিরোধিতায় যে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন তা জনগণ ভোলেনি।

দুর্নীতির মনোভাব নিয়ে কেউ জন্মায় না। মন্দ সমাজ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি প্রসার লাভ করে। বিগত সরকারগুলোর শাসনকার্যে কোনো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছিল না। ছিল না ক্ষমতার ভারসাম্য। তাই দুর্নীতি হয়ে উঠেছিল আমাদের দেশের এক নম্বর সমস্যা এবং বাংলাদেশও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত হয়েছিল এক নম্বর দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্রের সবগুলো খুঁটি, যার ওপর গণতন্ত্র সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এগুলো মজবুত করা প্রয়োজন। এই খুঁটিগুলোর মধ্যে দুর্নীতি দমন সবচেয়ে জরুরি। দেশে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। আলাদিনের চেরাগ হাতে নিয়ে যদি বলা হয়, হে দুর্নীতি দূর হও, তাহলে দুর্নীতি দূর হবে না। দুর্নীতি দূর করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এমন সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে সমাজে দুর্নীতিবাজেরা নিকৃষ্ট এবং ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়। তাদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান এবং আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত হতেও যেন মানুষ আগ্রহী না হয়। আমাদের দেশে একদিন এমন ঐতিহ্য ছিল যখন মানুষ সুদখোর, ঘুষখোর, দুর্নীতি-পরায়ণ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত হওয়াকে অপমানজনক কাজ হিসেবে বিবেচনা করতো। দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হতো। এই ব্যাপারে আমাদের ঐতিহ্য যেমন গৌরবমণ্ডিত, তেমনি আমাদের ভবিষ্যতও সম্ভাবনাময়।

এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধুরী দেশ থেকে দুর্নীতির শেকড় উপড়ে ফেলার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। দুর্নীতি দমন নয়, প্রতিরোধই হবে মূল লক্ষ্য। তিনি বলেছেন, আসুন অঙ্গীকার করি নিজেরা দুর্নীতি করবো না। অন্যকেও করতে দেব না। যে কোনো ভালো কাজে শুভলগ্ন দরকার। এখনই দুর্নীতি দমনের শুভলগ্ন। তিনি আরো বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী ঐতিহ্য ধারণ করে দুর্নীতির বদনাম ঘুচিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার এখনই সময় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে পারলেই দুর্নীতির প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

তিনি আরেকটি প্রবল সত্য উচ্চারণ করেছেন– আইন, তা যতই কঠোর হোক, তা দিয়ে স্থায়ীভাবে দুর্নীতি দমন সম্ভব নয়। আমরাও তাই মনে করি। সমাজকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হলে সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। এই প্রত্যয় নিয়ে তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সফর করেছেন।

উপমহাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে এদেশে বহু সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল– মহাত্মা গান্ধী, ড. জাকির হোসেন, সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফ্ফার খান, মওলানা মনিরুজ্জান ইসলামাবাদী, সাইফউদ্দিন কিচলু, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, সর্বোদয় নেতা বিনোবা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডা. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, খানবাহাদুর আহসানউল্লাহ, হাজী মোহাম্মদ মহসীন, আর পি সাহা সহ বহু মনীষীর হাত ধরে। তখন গড়ে উঠেছিল প্রবর্তক সংঘ, সর্বোদয়, রামকৃষ্ণ মিশন, গান্ধী আশ্রম, ইসলামিয়া মিশন, খোদাই খিদমতগার নামের বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তারা মানুষের মধ্যে সততা, সৎ পথের কথা এবং বিবেকবান হওয়ার কথা শুধু বলে বেড়াতেন না, নিজেরাও সৎ পথে থেকে সাধারণভাবে জীবন-যাপন করে সামাজিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি কোনো সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারিনি বলে আমাদের সমাজ মানি ওরিয়েন্টেড (অর্থ শাসিত) সমাজে পরিণত হয়েছে। দ্রুত ধনী হওয়ার প্রবণতার মধ্যে বেড়ে উঠেছে। যাদের টাকা আছে, তারা যদি অসদুপায়েও সে টাকা লাভ করে, তারা সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। তাই তাদের বিত্তের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অর্জন ও মূল্যবোধের সামঞ্জস্য থাকে না। তাদের বিত্ত এবং সংস্কৃতির মধ্যে বিশাল তফাৎ থাকে। এই সমাজে সৎ এবং গুণী এবং সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা সম্মান পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিরা কালো টাকা দিয়ে সম্মান অধিকার করে নেয় এবং পেশী শক্তি দ্বারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা পুষ্পপ্রেমিক হয় না, সঙ্গীতপ্রেমিক হয় না, শিল্পপ্রেমিক হয় না। তারা নিতান্তই নিম্ন রুচির মানুষে পরিণত হয়। তাদের বাড়িতে কোনো শিল্পীর চিত্রকর্ম যেমন থাকে না, তেমনি বই পড়ার অভ্যাসও থাকে না। তারা শুধু অর্থকে পূজা করে। সৎ মানুষ হওয়ার জন্য যে লেখাপড়া, সংস্কৃতি চর্চা প্রয়োজন, এদের মধ্যে এ ধরনের কোনো জ্ঞান চর্চার প্রবণতা নেই।

তারা কালো টাকা এবং পেশী শক্তির দ্বারা নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। যার ফলে তারা সংসদে কোনো অবদান রাখতে পারে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হলে আমাদের গণমাধ্যমকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে। ছোট শিশুরাও যেন সৎ মানুষ এবং দুর্নীতি-পরায়ণের পার্থক্য বুঝতে পারে। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীতে এমন জনঘনিষ্ঠ ধারা প্রবর্তন করতে হবে যাতে এই সব সামাজিক নাটকের ভিলেনদের মুখোশ খুলে যায়। যেন ক্রমশ আমাদের মধ্যে গুণীজন, সংস্কৃতিবান এবং সৎ মানুষকে সম্মান করার মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। যে সমাজে সৎ ও গুণী ব্যক্তিরা সম্মান পায় না, সে সমাজে গুণী ব্যক্তি জন্মায় না।

এই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে এমন সব মর্যাদাসম্পন্ন সৎ মানুষকে মাঠে নামতে হবে যাতে এই আন্দোলন কার্যকর হয়। এরকম মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে কম হলেও একেবারে নগন্য নয়। সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফলে এই সমস্ত সৎ এবং মর্যাদাবান লোক হতাশায় আক্রান্ত হয়ে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। অথবা বিদেশে পাড়ি জমান। সরকার যদি এ ধরনের সম্মানিত ব্যক্তিদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাদের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সৎ মানুষকে উৎসাহ দান করে তাহলে এ ধরনের আন্দোলন গড়ে না ওঠার কোনো কারণ নেই।

উল্লেখ্য, নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক শুধু অর্থলগ্নির সংস্থা নয়, তারা ষোল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে সামাজিক আন্দোলন তৃণমূলে গড়ে তুলেছেন তার অনুসরণে দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্দোলনও গড়ে তোলা সম্ভব। তৃণমূল পর্যায়ে যে সমস্ত এনজিও আছে, তারা অনেক ভালো ভালো কাজ করছে। যৌতুকবিরোধী, এসিড সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ বহু উন্নয়নমূলক কাজে তারা লিপ্ত আছেন। দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্দোলনে যদি এদের সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করবে। সৎ রাজনীতিতে বিশ্বাসী, দেশপ্রেমে

নিবেদিত প্রাণ, জনগণের বন্ধু, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাকর্মী আছেন, তাদেরকে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। তাহলে আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার হবে।

দুর্নীতিবাজদের চাঁদাবাজির খবর ছাড়া অন্যান্য সুনির্দিষ্ট গুরুতর অপরাধের খবর গণমাধ্যমে আসে না। এই সুযোগে দুষ্টজনেরা বাজারে নানা ধরনের গুজব ছড়ায়। তার জন্য দুর্নীতিবাজদের বড় বড় সুনির্দিষ্ট অপরাধের ফিরিস্তি (যদি তদন্ত কাজের জন্য ক্ষতিকর না হয়) গণমাধ্যমে আসা দরকার, যাতে জনগণ এই ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হয়। দুর্নীতিবাজদের কোনো রূপ ছাড় না দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যদি সুনিশ্চিত করা যায়, তাতে দুর্নীতি-বিরোধী মানুষের মনোবল বাড়বে। তারা হতাশাগ্রস্ত হবে না। এর ফলে দুর্নীতি-বিরোধী সামাজিক আন্দোলনে জনসাধারণের সহযোগিতাও বাড়বে।

Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে মানুষকে দুর্নীতির দিকে প্রলুব্ধ করে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতি-পরায়ণ মানুষে পরিণত করে। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে আমাদের সংবিধানিক ব্যবস্থায় এমন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংযোজন করতে হবে যাতে কোনো ব্যক্তি বা দল নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে না পারে। যাকে রাজনৈতিক ভাষায় বলে পযবপশং ধহফ নধষধহপবং (সরকারের ক্ষমতা অপব্যবহার রোধকল্পে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা)। যা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে আছে।

হাসান মশহুদ চৌধুরী সম্প্রতি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার যে আহ্বান জানিয়েছেন, আশা করি তাতে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সৎ ব্যক্তিদের নিয়ে বেসরকারি দুর্নীতি প্রতিরোধ সংস্থা গড়ে উঠবে। হাসান মশহুদ চৌধুরীকে সময়োচিত এই আহ্বান জানানোর জন্য অভিনন্দন জানাই।

দৈনিক সমকাল
২২ এপ্রিল ২০০৭

জনপ্রত্যাশা পূরণের এখনই সময়

অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্যের বীণার তারে হঠাৎ যখন বে-সুর বাজছিল তখন খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। সম্প্রতি তাদের কিছু ভুল পদক্ষেপের কারণে দেশে একটি সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সরকার মূলধারা থেকে সরে যাচ্ছে। যে মূলধারার প্রধান শর্ত ছিল বিগত সরকারের দলীয়করণ, অপশাসন এবং দুর্নীতির ফলে গণতন্ত্রের যে সমস্ত খুঁটিগুলো অকেজো হয়ে গেছে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ ব্যাপারে সঠিক সংস্কারের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠান। দীর্ঘ অপশাসনের ফলে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রে অনেক জঞ্জাল জমেছিল। সেই জঞ্জাল পরিষ্কারের দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করেছে। এ কারণে বর্তমান সরকার দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর, জনগণের, গণমাধ্যমের এবং দেশের সুশীল সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাও তাদের কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমি নিজেও এ সরকারকে সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি উপ-সম্পাদীয় ও দুটি কবিতা লিখেছিলাম। উদ্দেশ্য, বর্তমান সরকার সঠিক গণতন্ত্রের পথে যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন রয়েছে তা অপসারণ করছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন অভিযান চালাচ্ছে এবং দেশকে একটি সুন্দর, নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয়ার লক্ষ্যে আন্ত রিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়– একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, দুর্নীতিমুক্ত দেশ নির্মাণের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে।

আমার লেখায় আমি সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলাম তাড়াহুড়ো না করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার কাজগুলো যেন সম্পন্ন করে। এও বলেছিলাম, যেহেতু প্রশাসনে দক্ষ ও সৎ ব্যক্তির অভাব রয়েছে, সে কারণে সবগুলো কাজে যেন এক সঙ্গে হাত না দেয়। তাতে সমস্যা বাড়তে পারে।

কিন্তু সরকার সবগুলো কাজ ত্বরিত গতিতে করতে গিয়ে কিছু কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে বলে মনে হয়। প্রকৃত দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ চার্জশীট তৈরি করার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক পদক্ষেপ নিলেও একমাত্র চাঁদাবাজি এবং কিছু লঘু অপরাধ ছাড়া এ পর্যন্ত কোনো চার্জশীট দিতে না পারায় জনগণের মধ্যে কিছু হতাশা নেমে এসেছে। তবে দুদক প্রধান হাসান মশহুদ চৌধুরীর ওপর জনগণের আস্থা রয়েছে। তাতে সবাই মনে করছে অভিযোগগুলো যাতে প্রমাণিত হয় তার জন্য তিনি আটঘাট বেঁধে কাজ করছেন। যাতে প্রকৃত অপরাধীরা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছাড়া পেয়ে না যায়। ইতোমধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে চার্জশীটও দাখিল করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে সব রাঘব-বোয়ালদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়ার কথা সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন। তিনি এ ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন। বার বার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের কথাও বলে যাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার এখনই সময়। পরে এই সুযোগ নাও আসতে পারে।

বিগত জোট সরকারের সবচাইতে বড় অপকীর্তি নজিরবিহীন দুর্নীতি এবং নির্লজ্জভাবে দলীয়করণ। যদি বর্তমান সরকার সেই সব দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সুনিশ্চিত করতে না পারে তাতে জনগণের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়বে। এই হতাশা দূর করার জন্য এবং ভবিষ্যতে কোনো সরকার যেন দুর্নীতি করতে না পারে তার জন্য বর্তমান সরকার যে কঠিন পদক্ষেপ নেবে বলে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এ নিয়ে যেন কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বার বার তার ভাষণে বলেছেন, বর্তমান সরকারের সংস্কার নীতির মূল ভিত্তি হবে মুক্তিযুদ্ধের গণতান্ত্রিক চেতনা এবং একুশের অসাম্প্রদায়িক চেতনা। তার ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই বিচার বিভাগকে তারা প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার যে কাজ হাতে নিয়েছে তা জনগণ কর্তৃক নন্দিত হয়েছে। দুদক এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের ব্যাপারেও তারা সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। সৎ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন এখনো পুনর্গঠন হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, এই কাজটিও তারা অতিসত্ত্বর সম্পন্ন করবেন।

এ ব্যাপারে তাদের সদিচ্ছা নিয়ে জনগণের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই। কয়েকদিন আগে নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলী নিয়ে কমিশন সুশীল সমাজ, দেশের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। আশা করা যায়, এরকম প্রতিটি স্পর্শকাতর বিষয়ে শুধু

সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ নয়, রাজনীতিবিদদের সঙ্গেও তারা আলোচনা শুরু করবেন। সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো কোনো সদস্য রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে ঢালাওভাবে কটুক্তি করায় রাজনৈতিক মহলে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, আশাকরি এই ধরনের আলাপ-আলোচনার সূত্রপাতের মাধ্যমে তা প্রশমিত হবে। ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। বর্তমান সরকার স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকবে না। ২০০৮ সালের শেষভাগে যে নির্বাচন দেবে বলে অন্তবর্তী সরকার আশ্বাস দিয়েছে, সেই নির্বাচনে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা তো তাদের ছেড়েই দিতে হবে। কাজেই অকারণে রাজনীতিকদের প্রতি কঠিন এবং কঠোর মনোভাব পোষন না করাই শ্রেয়। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের প্রশ্নে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু মাইনাস টু তত্ত্বের ভিত্তিতে নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে তারা জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মতামত নিয়ে দলের সংস্কার করা উচিত। তবে বাইরে থেকে চাপিয়ে দিলে এই সংস্কারের ফল বিপরীত হতে পারে। দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির ভিত্তিতে সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে দলের সংস্কার করলে তা স্থায়ী হবে না। সংস্কার সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। নিজেদের তাগিদে সংস্কার হলে সেটাই হবে স্থায়ী সংস্কার।

রাজনীতির ভবিষ্যতকে দেখার প্রখর দৃষ্টিশক্তি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। পরবর্তীকালে এই দূরদৃষ্টির অধিকারী হতে পারেননি কোনো রাজনীতিবিদ। তাই তারা রাজনীতির পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছেন, পথভ্রান্ত হয়েছেন, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্নীতিবাজদের দল থেকে বিতাড়িত করেননি। বরঞ্চ এসব কালো টাকার মালিক এবং পেশী শক্তিকে দলের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আমাদের রাজনীতিবিদদের কর্মদক্ষতা, নীতিবোধ, সততা এবং সাহসের মহড়া দিয়ে শ্রেয়বোধের অধিকারী হতে হবে। দলের রাজনীতি যাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিংবা পরিবারতান্ত্রিক না হয় সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেন দলের নীতি নির্ধারণ করা হয় এবং একই পদ্ধতিতে তরুণেরা যেন প্রবেশাধিকার পায় ও নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারে সেই দুয়ারও অবারিত করতে হবে।

গত কয়েকদিন ধরে খালেদা ও হাসিনার বিরুদ্ধে আরোপিত প্রেসনোট, পরে তা প্রত্যাহার নিয়ে যে ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে দেশী এবং আন্তর্জাতিক মহলে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিদেশী মিডিয়াগুলোও এটি ফলাও করে প্রচার করতে থাকে। দেশে-বিদেশে বর্তমান সরকারের ভূমিকা নিয়েও সংশয় দেখা দেয়। ভুল বুঝতে পেরে সরকার বিষয়টি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। নিজেদের ভুল বুঝতে পারা এবং তা ত্বরিত গতিতে সমাধান সরকারের শুভবুদ্ধি ও আন্তরিক পদক্ষেপেরই বহিঃপ্রকাশ। দ্রুত এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে একটি অত্যাসন্ন সংকট থেকে দেশ বেঁচে যায়। যা নিয়ে সংকটটি তৈরি হয়েছিল সরকার প্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে তার সমাধান হওয়ায় সকল উৎকণ্ঠার অবসান হয়েছে এবং সরকার জনগণ কর্তৃক প্রশংসিতও হয়েছে। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তার ফলাফল সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। এরকম বিশ্লেষণের অভাবে অনেক সময় ভালো পদক্ষেপেরও সুফল পাওয়া যায় না।

এই প্রেস নোটের কারণে শেখ হাসিনার দেশে ফিরতে না পারা এবং খালেদা জিয়ার বিদেশে যাওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে দেশের শাসন ক্ষমতা কি সেনা বাহিনীর হাতে চলে যাচ্ছে? সেনা প্রধান মইন উ আহমেদ এ ব্যাপারে তার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তার এই বক্তব্য অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং এই বিষয়ে জনগণের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ছিল তাও দূর হয়েছে। তিনি বলেছেন, ক্ষমতা দখলের ইচ্ছা আমাদের আগেও ছিল না, এখনো নেই। তবে এদেশে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট। তিনি বলেন, সেনা বাহিনী ক্ষমতা দখল করতে চাইলে ১১ জানুয়ারি পূর্ববর্তী সময়ে দেশে যে মহাসংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তখন আমাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ ছিল ক্ষমতা দখল করার। কিন্তু আমরা তা করিনি। আমরা চেয়েছি দেশটাকে বাঁচাতে, দুর্নীতিমুক্ত করতে। দুর্নীতিমুক্ত করার কাজে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাবো। কোনো দুর্নীতিবাজকে রেহাই দেয়া হবে না।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে সরকার তার প্রতি কী আচরণ করবেন? রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য তাকে কি গ্রেফতার করা হবে, নাকি গৃহবন্দী করা হবে, নাকি তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দিয়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হবে। তা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বহু গুজব, জল্পনা-কল্পনা চলছে।

খালেদা জিয়া ওমরাহ্ পালন করতে গেলে তাকে দেশে আসতে দেয়া হবে না, এ ধরনের রটনাও শোনা যাচ্ছে। যে কোনো ধরনের রটনা, গুজব, জল্পনা-কল্পনা সুশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর। তাতে তিল তাল হয়ে যায়। সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে বহু বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই জনসাধারণের সন্দেহ নিরসন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি কিংবা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিলে খুবই ভালো হয়। জনসাধারণ তাই আশা করে।

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা, যে সদুদ্দেশ্য এবং সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে দেশের মহা সংকটকালে তারা ক্ষমতায় আরোহণ করেছেন সেই উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি কার্যকর করতে তারা যেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না ভোগেন। কোনো ধরনের চাপের মুখে দেশকে পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে ফেলে তারা যেন হতাশায় মগ্ন হয়ে হাল ছেড়ে না দেন। জনগণ এই ব্যাপারে সরকারকে অব্যাহত সমর্থন দিয়ে যাবে।

দৈনিক যুগান্তর
৬ মে ২০০৭

সাহসী জননীর কাছে বুড়ো সন্তানের আকিঞ্চন

৭ মে ২০০৭ শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যবর্তনের তারিখ ছিল। পত্রিকা মারফত জানতে পেরেছিলাম আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বিমান বন্দরে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছে সরকার।

আমি উত্তরায় বসবাস করি। ওই দিন বিকেল চারটারদিকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গুলশান যাচ্ছিলাম। বিমানবন্দরের কাছাকাছি এসে গাড়ি আর সামনের দিকে এগুতে পারল না। দেখি গোটা এলাকা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, জরুরি অবস্থাকে উপেক্ষা করে সমস্ত ভয়, সংশয়, ঝুঁকি মাথায় নিয়ে হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দু'পাশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়ো হয়েছে শেখ হাসিনাকে এক পলক দেখার জন্য, তাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য। একান্নদিন পর দেশের মাটিতে ফিরে বিমানবন্দর থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পথে হাজারো মানুষের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় সিক্ত হলেন শেখ হাসিনা। বিমানবন্দরে বললেন, আমাকে দেশে ফেরার পথে বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করতে গিয়ে সরকার যে ভুল করেছিলেন সে ভুলের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। বহু তাৎপর্যপূর্ণ কথা। বললেন, নিষেধাজ্ঞা ভুল ছিল। আশা করি, আর ভুল করবেন না। তখন হঠাৎ করে বৃষ্টি এসেছিল। আঁধার হয়ে এসেছিল আকাশ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে জনগণ স্লোগান দিল ঝড় বাদলে আঁধার রাতে, আমরা আছি তোমার সাথে। যেন অন্ধকারে একখণ্ড আলো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু মুজিবের সাহসী কন্যা। ২৬ বছর আগে ১৯৮১ সালে বৈরী পরিবেশে দেশে ফিরে প্রথমেই গিয়েছিল ধামন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে। যে বাড়িতে দুর্বৃত্তরা সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় পরিবারসমেত বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল। সেদিন সেই পোড়ো বাড়িতে ফিরে শেখ হাসিনার হৃদয়ে যে ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছিল, যে আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল অচিরেই তা পরিণত হল সাহসে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিকে সংগঠিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শেখ হাসিনা সাহসের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন।

শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তনকে কি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যবর্তনের সঙ্গে তুলনা করব? হ্যাঁ, না। হ্যাঁ, এজন্য বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিমানবন্দর থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত পথ লোকে লোকারণ্য ছিল। তেমনি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অনুভবে ৭ মে ২০০৭ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল বিমানবন্দর।

বলা বাহুল্য, এই জন সমাবেশ আওয়ামী লীগের আয়োজনে সংগঠিত হয়নি। প্রাণের টানে মানুষের ঢল নেমেছিল পথে পথে। আওয়ামী লীগ একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। জরুরি অবস্থা জারি হবার পর থেকে তারা খুবই সতর্কভাবে কথা বলে আসছে এবং তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপও জরুরি অবস্থার কারণে স্থগিত রেখেছে। ফলে আইন ভঙ্গ করে বিমানবন্দরে পার্টির উদ্যোগে শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানানোর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। যে উদ্যোগ ছিল ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন দীর্ঘ ৯ মাস পর মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন স্বদেশে। শেখ হাসিনাও স্বাধীন স্বদেশে ফিরেছে। তবে অন্য পরিবেশে, ভিন্ন প্রেক্ষিতে, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে। তার অবর্তমানে একান্ন দিনে দেশে অনেক কিছু ঘটেছে। এক সময় মনে হয়েছিল সরকার বোধহয় তাকে দেশে ফিরতে দেবে না। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। দেশে এখন জরুরি অবস্থা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিণত হয়েছে অন্তবর্তী সরকারে। দেশে অবাধ, স্বাধীন, দল নিরপেক্ষ নির্বাচনের শর্ত পালন করতে গিয়ে তারা দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য এবং গণতন্ত্রের পথ সুগম করার জন্য নির্বাচনের বাইরেও অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপারে দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনী, জনগণ, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং সৎ রাজনীতিবিদদের সমর্থন পেয়েছে। শেখ হাসিনাও তাদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বার বার তাগিদ দিচ্ছেন নির্বাচন ত্বরান্বিত করার জন্য। দেশের মাটিতে ফিরতে পেরে আবেগে আপ্লুত হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে বলেই আমার দেশে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। আমি দেশের মাটিতে ফিরতে পেরেছি এটাই বড় কথা। এতেই আমি খুশি। খালেদা জিয়ার মতো তাকেও গৃহবন্দী করা হবে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাকে দেশের ফেরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সরকারের ভুল ছিল। এরপর তাকে গ্রেফতার বা অন্তরীণ করা হলে সরকার আবার সেই ভুল করবেন। সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগের সংস্কার আওয়ামী লীগ নিজেই করবে। এটা অন্য কেউ চাপিয়ে দিলে হবে না।

এই প্রসঙ্গে আমি আমার অন্য একটি নিবন্ধে বলেছি, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের প্রশ্নে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু মাইনাস টু তত্ত্বের ভিত্তিতে নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে তারা জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মতামত নিয়ে দলের সংস্কার করা উচিত। তবে বাইরে থেকে চাপিয়ে দিলে এই সংস্কারের ফল বিপরীত হতে পারে। বাইরের চাপ নয়, নিজেদের তাগিদে সংস্কার হলে সেটাই স্থায়ী হবে। রাজনীতির ভবিষ্যতকে দেখার প্রখর দৃষ্টিশক্তি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। পরবর্তীকালে এই দূরদৃষ্টির অধিকারী হতে পারেননি কোনো রাজনীতিবিদ। তাই তারা রাজনীতির পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছেন, পথভ্রান্ত হয়েছেন, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্নীতিবাজদের দল থেকে বিতাড়িত করেননি। বরঞ্চ এসব কালো টাকার মালিক এবং পেশী শক্তিকে দলের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আমাদের রাজনীতিবিদদের কর্মদক্ষতা, নীতিবোধ, সততা এবং সাহসের মহড়া দিয়ে শ্রেয়বোধের অধিকারী হতে হবে। দলের রাজনীতি যাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিংবা পরিবারতান্ত্রিক না হয় সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেন দলের নীতি নির্ধারণ করা হয় এবং একই পদ্ধতিতে তরুণেরা যেন প্রবেশাধিকার পায় ও নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারে সেই দুয়ারও অবারিত করতে হবে।

শেখ হাসিনার পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন বাঙালি, জাতির জনক। তার সঙ্গে এক প্লাটফরমে না হলেও ভিন্ন প্লাটফরমে একই সময়ে সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি রাজনীতি করেছি। আদর্শের কারণে দুজন নিকটবর্তী হয়েছি। তাঁর স্নেহ পেয়েছি। এটা আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। আমার বয়স এখন ৮১ বছর। আমি হাসিনাকে কন্যাসম স্নেহ করি। মায়ের সম্মানে ভালোবাসি। নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে প্রবলভাবে শ্রদ্ধা করি।

মা, রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার জনগণ বৈরী পরিবেশে তোমাকে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, আমি জানি তা তোমার অন্তর স্পর্শ করেছে। ক্ষমতায় গেলে এর বিনিময়ে দেশবাসীকে তুমি কি উপহার দেবে? দেশবাসী তোমার কাছে সব পেয়েছির দেশ আশা করে না। আশা করে সুখী সমৃদ্ধশালী দুর্নীতিমুক্ত একটি দেশ। আশা করে অতীতে যে ভুল-ভ্রান্তির কারণে আওয়ামী লীগ ২০০১ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি (নির্বাচনে কারচুপির পরও ক্ষমতায় আসত) সেই ভুল-ভ্রান্তিগুলো সংশোধনের জন্য এবার যেন তুমি শক্ত হাতে আওয়ামী লীগের হাল ধরো। দুর্নীতি পরায়ণ এবং সন্ত্রাসী বলে পরিচিত যেসব ব্যক্তি তোমাকে ঘিরে রাখে তাদের দল থেকে বের করে দেয়ার সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করো।

আওয়ামী লীগের ভিত্তি হলো অসাম্প্রদায়িকতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং সম্পদের সুষম বণ্টন। ধর্মনিরপেক্ষতা আওয়ামী লীগের প্রধান ভিত্তি। কোনোভাবে কোনো কারণে এ ব্যাপারে কারো সঙ্গে আপস করো না। এর ভিত্তিতে রাজনীতিতে স্বচ্ছ, জবাবদিহিতা এবং গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন করো। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারের এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। সুষ্ঠু জীবনবোধ-সম্পন্ন বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, মানবতাভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সৎ মানুষের মিলনক্ষেত্র হিসেবে আওয়ামী লীগকে গড়ে তোল। গোটা জাতিকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ঐক্যবদ্ধ করো।

আমি জানি, তুমি মৃত্যু-ভয়ে ভীত নও। কোনো প্রলোভন তোমাকে টলাতে পারে না। আমি আরো জানি, আমি যা বলছি তা তোমার সংস্কার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। তবুও তোমাকে একটু সচেতন করার জন্য এই আবেদন। যেমন বঙ্গবন্ধুর জীবনকালে তাঁকেও একটি খোলা চিঠির মারফতে এ ধরনের একটি আবেদন জানিয়েছিলাম।

তুমি আমার সম্মানিত জননী। এই বুড়ো সন্তানের আকিঞ্চনকে ভুল বোঝ না। আমি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছি তুমি বঙ্গবন্ধুর শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হও।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১০ মে ২০০৭

ছাত্র রাজনীতি : ফিরে আসুক পরীক্ষিত ভূমিকায়

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা কিংবা ছাত্রদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত, কি উচিত না– এ বিষয়টি বহুল আলোচিত। এ ব্যাপারে বহু তর্ক হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে। আর বিতর্ক নয়, এর একটি সুরাহা হওয়া দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত। আবার কারো মতে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা ঠিক হবে না। তবে বিদগ্ধজনেরা মনে করেন, ছাত্রদের দেশের কল্যাণে রাজনীতি করা উচিত। দেশের সংকটকালে তারা অবশ্যই আন্দোলনের সম্মুখভাগে এসে দাঁড়াবেন, জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দেবেন, জনগণের মধ্যে উৎসাহ ও সাহস জোগাবেন। কিন্তু অন্য সময়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রের মতো মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবেন এবং শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা ও সংকট কাটিয়ে উঠতে পরামর্শ এবং সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

ছাত্ররা রাজনীতিমনস্ক হবেন এবং সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে জাতীয় সংকটে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন– এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু বিদ্যার প্রতি অনুগত থেকে আচার-আচরণ এবং ব্যবহারে তারা যে দেশের প্রাণশক্তি তা প্রমাণ করতে হবে। কার্যকলাপের দ্বারা তারা যেন মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারেন সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

ছাত্ররা রাজনীতিতে ছিল বলেই সমাজের অগ্রগামী অংশ হিসেবে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা সেদিন যদি নিষেধাজ্ঞা অমান্য না করত তাহলে ভাষা আন্দোলন আপসকামিতায় পর্যবসিত হতো। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে হাজার হাজার ছাত্রকর্মী গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয়ী হয়েছিল। ৬২ সালের আন্দোলনে, ৬-দফার আন্দোলনে, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্ররাই ছিল সমস্ত আন্দোলনের প্রাণশক্তি। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও ছাত্ররা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে স্বৈরাচারের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ছাত্র রাজনীতির অত্যন্ত উঁচুমানের এই ভাবমূর্তি আর অব্যাহত থাকেনি। ছাত্রদের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং দলীয় প্রভাবের কারণে অতি দ্রুত অবক্ষয় ঘটে ছাত্র রাজনীতির। ছাত্র রাজনীতিতে অস্ত্রের ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যায় অধিকহারে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই সংঘর্ষের অনেক সাধারণ নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রী প্রাণ হারানোর ঘটনা ঘটেছে। ছাত্র রাজনীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শিক্ষকদের ওপর ছাত্রদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ছাত্র রাজনীতি মূলত পেশীশক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অনৈতিক পন্থায় লাখ লাখ টাকা উৎকোচ নিয়ে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। এর পেছনে অনেক শিক্ষকও জড়িয়ে পড়েছে বলে প্রতিনিয়ত পত্রিকায় এই বিষয় সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য বেরুচ্ছে। এরকম অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের কাছে ছাত্রদের মেধা বিলীন হয়ে যায়।

ছাত্রদের শিক্ষানবিশকালে নির্দিষ্ট কোনো দলের মুখাপেক্ষী হয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। সকল ছাত্র ঐক্যবদ্ধ এবং একই ছাতার তলে থেকে ছাত্রদের সমস্যা, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তারা যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাবে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে উপরোল্লেখিত সাফল্যমণ্ডিত আন্দোলনসমূহে ছাত্রসংগঠনগুলো আলাদা আলাদা হয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় অংশ নেয়নি। তারা সমন্বিতভাবে জাতীয় সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছিল বলেই এসব আন্দোলন সফলকাম হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে এবং ছাত্ররা এসব রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি করছে। দলীয় স্বার্থের জন্য পড়াশোনার পরিবর্তে তারা বিভিন্ন অবৈধ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। এই সব কর্মকাণ্ড জাতির জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনি। এর ফলে সাধারণ ছাত্রদের জীবনও দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তির দরুণ আজ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর সেশন জট লেগে আছে। দু'দলের মারামারি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে অনির্দিষ্টভাবে মাসের পর মাস বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সঠিক সময়ে ছাত্ররা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করতে পারে না। জীবনের একটা মূল্যবান সময় অপচয় হয়। যা দেশ ও জাতির উন্নয়নকে অনেকখানি বাধাগ্রস্ত করে থাকে। জাতীয় রাজনীতির

স্বার্থেই ছাত্র রাজনীতির সুষ্ঠু ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। অনেকে বলে থাকেন আজকে যারা ছাত্র তারাই আগামী দিনের রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেবে। তাই ছাত্র রাজনীতির আবশ্যকতা রয়েছে। বিষয়টি অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে যে ছাত্র রাজনীতি প্রচলিত আছে তার ছায়াতলে এসে ছাত্ররা ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃত রাজনীতিবিদ হয়ে উঠতে পারছে না।

দেখা গেছে, যারা মেধাবী ছাত্র তারা অনেকেই আমাদের প্রচলিত রাজনীতির নোংরামীর জন্য রাজনীতিতে আসতে চায় না। ফলে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমে ক্রমে মেধা শূন্য হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে সামরিক শাসন উত্থানের পর থেকে যারা ছাত্র রাজনীতিকে পুঁজি করে আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে, তাদের কেউ প্রকৃত রাজনীতিবিদ হতে পারেননি। এরা রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠ থেকে সনদ নিয়ে বড় নেতা বনে যাচ্ছে। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশে একজনও জনদরদী মেধাবী প্রকৃত রাজনীতিবিদ ছাত্র রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারল না। একজনও হতে পারল না বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো মেধাবী ছাত্রদের, যারা জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে তাদের কখনোই পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। তারা সব সময়ই ছাত্রদের নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে।

দেশের ছাত্রশক্তিকে একটি জ্বলন্ত মশালের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তারা আলো দেয়, পথ দেখায়, আবর্জনা পোড়ে। আবার ঘরও পোড়ায়, মানুষের শান্তির নীড়কে তছনছ করে দেয়, শিক্ষা প্রাঙ্গণকে গড়ে তোলে কলহ-বিবাদ, খুন-খারাবির কেন্দ্রস্থল। যেই দল ক্ষমতায় আসে সেই দলের ছাত্র সংগঠন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস ও দলীয় রাজনীতির কবলে ফেলে কলুষিত করে তোলে। হল দখল, শিক্ষক নিয়োগে প্রভাব খাটানো, অন্য দলের ছাত্র পিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে যখন অন্য দল ক্ষমতায় আসে।

ছাত্র রাজনীতি কোনো নতুন বিষয় নয়। ব্রিটিশ আমলে ছাত্র রাজনীতির গোড়া পত্তন হয়েছে। তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণ ছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রশ্নে। তা ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনায় গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলন। সেই সময় যে শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা ছিল না তা নয়। তবে তা ছিল বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর আইয়ুব খানের আমল থেকে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সূচনা। গণতন্ত্রের দাবিতে এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনকে সমূলে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য মোনেম খাঁ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এনএসএফ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন নামে একটি ছাত্র সংগঠন গঠন করে। এই সংগঠনের ক্যাডাররা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজত্ব কায়েম করে এবং সম্মানিত শিক্ষকগণকে মারধর করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। তখন থেকে শুরু হওয়া শিক্ষাঙ্গনে খুন-খারাবি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ইদানীংকালে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে ছাত্রীদের ওপরও বিভিন্নভাবে হামলা, নির্যাতন বেড়ে গেছে। তাদের শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, উত্যক্ত করা সহ বিভিন্ন প্রকার অপকর্ম চলছে।

শুধু ছাত্ররা নয়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও দলীয় রাজনীতির অংশীদার হয়ে উঠেন। এই অংশীদারিত্বের ভূমিকার ওপর যেহেতু তাদের পদোন্নতি নির্ভর করে সেজন্য তারা শিক্ষকের সমস্ত মর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিয়ে নির্দিষ্ট দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকেন। সরকার বদলের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রক্টর, প্রভোস্ট, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, এমনকি সরকারি স্কুলসমূহের হেডমাস্টার পর্যন্ত– সবাইকে সরিয়ে নিজের দলের অনুগত ব্যক্তিদের এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। যেহেতু এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দলীয় আনুগত্যকে প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যারা নিয়োগ পান তাদের প্রজ্ঞা, মেধা, ইমেজ, অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক দক্ষতা বলতে কিছুই থাকে না। সমাজে সম্মানিত শিক্ষকের মর্যাদা পায় না তারা। ব্রিটিশ আমলে এমনকি পাকিস্তান আমলেও কোনো কোনো শিক্ষক তাদের মেধা এবং ব্যক্তিত্বের কারণে প্রতিষ্ঠানে (ইনস্টিটিউশন) পরিণত হতেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই রকম শিক্ষক আর তৈরি হয় না।

এদ্দিন শুধু ছাত্র রাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে কথা হতো। এখন শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধের জোর দাবি উঠেছে। শিক্ষকের মর্যাদা অতি উচ্চে। দল মত নির্বিশেষে সকলের কাছেই তারা সমান। বর্তমানে শিক্ষকরা দলীয়

রাজনীতিতে এমনভাবে জড়িয়ে গেছেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের যে নিরপেক্ষ একটি ভূমিকা তা তারা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অনেক সময় দলীয় স্বার্থে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েও ছাত্রদের প্ররোচিত করছেন।
শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয়করণের ফলে সাধারণ ছাত্রদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আবাসিক হলে সিট নিয়ে প্রায়ই দলাদলি, মারামারি অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা অন্যান্য দলের ছাত্রদের হল থেকে বিতাড়িত করে দেয়। যেহেতু শিক্ষকরাও সরকারি দলের অনুগ্রহের পাত্র, তারা এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেন না। বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী তিনিও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারেন না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন দুর্নীতিতে কলঙ্কিত হয়ে ওঠে। শিক্ষকরা ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নির্দেশে ওঠে আর বসে। এরকম লজ্জাজনক পরিস্থিতি এবং পরিবেশের মধ্যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে। এসব শিক্ষকের মধ্যে মানবিক গুণের ঘাটতি দেখা দেয়।

কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা নতুন ভর্তি হয় কিংবা যারা হোস্টেলে থাকে তাদের রাজনীতির প্রতি আগ্রহ থাকুক আর নাই থাকুক ছাত্র-ছাত্রী নামধারী বিভিন্ন দলের ক্যাডাররা তাদের মিছিল মিটিংসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের যেতে বাধ্য করে। আর যেতে না চাইলে তাদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে থাকে। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে অনেক ছাত্র-ছাত্রী রাজনীতি করার জন্য তাদের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে না। কারণ পাস করে বেরিয়ে গেলে ক্যাম্পাসে তাদের আধিপত্য কমে যাবে। যেখানে ৪/৫ বছরের মধ্যে পাস করে বেরিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে ৮/১০ বছরেও তারা পাস করতে পারে না বা করে না। এভাবে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে নিয়ে যায় অন্ধকারের দিকে। ছাত্র ছাড়াও শিক্ষাঙ্গনে বহিরাগতদের দাপটও কোনো অংশে কম নয়।

শিক্ষাঙ্গন একটি পূত-পবিত্র স্থান। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় হলো একশ্রেণীর আদর্শহীন, নীতি ও বিবেক বর্জিত ছাত্র-শিক্ষক ও রাজনীতিকদের অপতৎপরতার জন্য শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। শিক্ষা হচ্ছে প্রতিটি জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু আজ সুশাসনের অভাবে সেই মেরুদণ্ড অকেজো হয়ে গেছে।

শিক্ষাঙ্গনে এসব দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে সর্বমহল থেকে আজ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি উঠেছে। ছাত্র রাজনীতি ছিল, আছে এবং থাকবে। তবে তা হবে নিরপেক্ষ, নির্দলীয় এবং জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ছাত্ররাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্রদের এসব অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। দেশ ও জাতির প্রতি ছাত্রদের রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। ছাত্ররা রাজনীতি করবে। কিন্তু কোনো দলের লেজুড় হবে না। নিজস্ব সত্তা, স্বকীয়তা ও ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে দেশের জন্য কাজ করে যাবে। তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, তথাকথিত দলীয় দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতির কালোথাবা থেকে ছাত্র সমাজকে মুক্ত হতে হবে। ছাত্রদের দলীয় লেজুরবৃত্তির রাজনীতি বন্ধ করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে আইন প্রণয়নের কথা বলছেন, তা নিয়ে ছাত্র সমাজকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে রাজনীতিবিদদেরও। জেদের বশবর্তী না হয়ে এর ইতিবাচক দিকসমূহ অবশ্যই গ্রহণ করতে এবং নেতিবাচক দিকগুলো বর্জন করতে হবে।

দৈনিক সমকাল
২৭ মে ২০০৭

আলোর সন্ধানে দেশ
সৎ মানুষের খোঁজে দেশ

এমন এক দুর্দিনে বর্তমান সরকার ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল, এই রকম দুর্দিন আমাদের জাতীয় জীবনে কদাচিৎ এসেছে। ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে নীল-নক্শা তৈরি করেছিল জোট সরকার, তা যদি বাস্তবায়িত হতো তাহলে হয়তো গৃহযুদ্ধ, না হয় আবার লুটেরাদের রাজত্ব কায়েম হতো। যে লুটেরা শ্রেণী গত পাঁচ বছর লুটতরাজ করে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার খুঁটিগুলো অকেজো করে দিয়ে দেশকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

এসব কথা চিন্তা করে দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনী, জনগণ এবং সৎ রাজনীতিবিদেরা তাদের এই ক্ষমতা গ্রহণকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন দিয়েছিল। মিডিয়া এবং সুশীল সমাজ তাদের এই আগমনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বিভিন্ন ফোরামে এবং কাগজের পাতায় কখনো পরামর্শ দিয়ে, কখনো তাদের কাজ যাতে সহজতর হয় এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় বসে বর্তমান সরকারকে তার লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। বর্তমান সরকার গত চার মাসে অনেকগুলো বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছেন। কোনো কোনো কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। তারা নির্বাচন কমিশনকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ দিনে দিনে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। তবে এই কমিশনকে স্বশাসিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তাদের স্বাধীন এবং অবাধ করার কাজটি এখনো বাকি রয়ে গেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের শীর্ষ পদে এমন একজন ব্যক্তিকে বসানো হয়েছে, যিনি সাহসী এবং তার কি করতে হবে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি বার বার বলেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এজন্য তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এই জনসমাবেশে তিনি একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন। বলেছেন, দুর্নীতিকে সম্পূর্ণভাবে দেশের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করার এখনই সময়। এই সুযোগ ভবিষ্যতে নাও আসতে পারে।

বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের কাজটিও তারা আন্তরিকভাবে হাতে নিয়েছেন। আমরা প্রতীক্ষা করছি, কখন বিচার বিভাগে স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা, সততা এবং নির্ভীকতা ফিরে আসবে। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য অনুয়ায়ী এরজন্য কি আমাদের বিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে? বর্তমান প্রধান বিচারপতির মতো অন্যান্য বিচারপতিরাও জনসমক্ষে তুলে ধরবেন বিচার বিভাগের সমস্যা এবং সংকটের কথা। বিচার বিভাগের সমস্যার মূল খুব গভীরে। কথা দিয়েও কখনো কোনো নির্বাচিত সরকার সেই গভীরে হাত দেননি। কারণ এ সমস্যার সমাধান নিয়ে তাদের কোনো উৎসাহ ছিল না। তাদের অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী শাসন যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। যতটা আগ্রহ ছিল ক্ষমতায় টিকে থাকার। সে জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিতে আমাদের কোনো নেতা-নেত্রী কেউ হাত দেননি।

আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সুসংগঠিত করার জন্য চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সা'দত হোসেনকে। সৎ ও দক্ষ আমলা হিসেবে তার সুনাম আছে। তিনি কমিশনের স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন হাজার হাজার তেলেপোকা। প্রতিটি চেয়ারে চেয়ারে দংশনে উন্মুখ ছারপোকা।

এই কমিশনকে অতীতের প্রতিটি সরকার তাদের এমন আজ্ঞাবহ করে রেখেছিল, সেখানে কোনো সৎ মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, সংস্কৃতিবান মানুষ, সুদক্ষ মানুষ চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের দলের ব্যক্তিকে কমিশনের বিভিন্ন পদে বসিয়ে অনেকটা জমিদারি হালে যাকে ইচ্ছা তাকে, অযোগ্য ব্যক্তিকে বিভিন্ন উচ্চতর পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। শুনেছি, এমন কোনো পদ নেই যে পদ ঘুষ ছাড়া কেউ পেয়েছে। অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নমালা ফাঁসের ঘটনাও তখন ঘটেছে। এই বিশৃংখলার কারণে সরকারি, আধা সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোনো সৎ এবং দক্ষ ব্যক্তি নিয়োগ পাননি। ফলে

প্রশাসন শুধু দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে তা নয়, যোগ্যতাহীনতায় প্রশাসনের মান এত নিম্নে নেমে এসেছিল যে এই প্রশাসনে কোনো ব্যক্তিকে শুদ্ধ ইংরেজি কিংবা বাংলা লিখতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হতো। এই ধ্বসের বোঝা বহন করেছে জনগণ। তাই স্বাধীনতার ছত্রিশ বছরেও জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন আসেনি। নেতা-নেত্রীদের যতই মহান বলা হোক না কেন, যতই বলা হোক না ইতিহাসের বড় নায়ক, কিংবা নায়িকা, তাদের মনোভাবের কোনো রূপান্তর ঘটেনি। প্রয়োজনের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। কখনো সামরিক শাসন, কখনো গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার, কখনো স্বৈরতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটা গোঁজামিলের ব্যবস্থা আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে চালু রয়েছে। আর চিরদিনই জনগণের রক্ত ও শ্রমের মূল্যে যেটুকু পরিবর্তন এসেছে তার ফলটা ভোগ করেছে লুটেরা শ্রেণী, জনগণ নয়।

এমন একটি জটিল অবস্থায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে। গত ২৫ মে ২০০৭ নজরুলের জন্মবার্ষিকীতে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার জন্য আমরা ক্ষমতায় এসেছি। তিনি নিরন্নের অন্ন প্রাপ্তির, গৃহহীনের গৃহ প্রাপ্তির অধিকারের কথাও বলেছেন এবং তার বিভিন্ন বক্তৃতায় তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার কথা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। জনগণ আশান্বিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন, দুদক, বিচারবিভাগ এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এটা আশার কথা। ব্যক্তি যতই সৎ এবং দক্ষ হোক না কেন শুধু ব্যক্তির সততার ওপর এসব বিভাগগুলো চলতে পারবে না যদি না এই কমিশনগুলোকে স্বাধীন, স্বরাজ এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ থেকে দূরে না রাখা যায়। সাংবিধানিক ব্যবস্থায় এই সব বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা না যায়।

ড. ইউনূসকে স্বপ্নচারী বলা হলেও মাঝে মাঝে আমাদের রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে বহু সাহসী বক্তব্য রেখেছেন। তিনি কখনো কখনো ঢালাওভাবে বলেছেন, রাজনীবিদেরা অর্থ উপার্জনের জন্য ক্ষমতায় আসেন। তার এই বক্তব্য শতভাগ সত্য না হলেও একেবারে মিথ্যা নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা তাই দেখি। 'কানে বিড়ি, মুখে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' থেকে শুরু করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেয়ার মধ্যদিয়ে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম পর্যন্ত এবং পরবর্তী ছত্রিশ বছর আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় যেসব ব্যক্তিরা দেশ শাসন করেছেন তাদের আমলনামা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– 'উকুন বাছতে কম্বল উজাড় হয়ে যাবে'। ফলে পুরনো সংকট এবং সমস্যা বার বার ফিরে এসেছে আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে, ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়েছে বটে পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটেনি।

এই পরিস্থিতি রূপান্তর ঘটাবার বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতার মঞ্চে অধিষ্ঠিত। আমি আমার আগের লেখায় বার বারই বলেছি, এখনই সময় সমাজে রূপান্তর ঘটাবার। কিন্তু সেই রূপান্তর ঘটানোর একপর্যায়ে যখন দেখি ডান-বাম-মধ্যপন্থী গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতাদের দুষ্কর্ম ও দুর্নীতির খতিয়ান, তখন হতাশ হয়ে পড়ি। যাদের ভাবতাম মূলধারার রাজনীতিবিদ হিসেবে, মূলধারার রাজনীতির উত্তরাধিকারী বলে তাদের দুর্নীতির বিস্তৃতি দেখে আফসোস হয় এতদিন কিভাবে তাদের সমর্থন দিয়েছি। মূলধারার রাজনীতি সততার রাজনীতি। মূলধারার রাজনীতি আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার রাজনীতি। মূলধারার ঐতিহ্য ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ঠেলে দেয়। এই চেতনা আমাদের সৎ বাঙালি হতে শেখায়। সৎ মানুষ হতে শেখায়। এই চেতনা আমাদের গণতান্ত্রিক বোধকে সমৃদ্ধ করে। আর সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রেরণা দেয়। ধর্মান্ধতার কবল থেকে আমাদের মুক্ত করে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মুক্তচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে।

এ চেতনার সঙ্গে কোনোভাবে দুর্নীতি পাশাপাশি চলতে পারে না। এই চেতনা সব সময় মানুষের অন্তর্নিহিত সততাকে উজ্জীবিত করে। গণতন্ত্রকে রাহুমুক্ত করতে শেখায়। অথচ গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতাদের মুখ থেকে যে সমস্ত স্বীকারোক্তি পত্র-পত্রিকায় দেখছি, তাতে মনে হয়, এরা দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন। এতদিন ধরে তারা যা করেছেন তা রাজনীতি নয়, রাজনীতি নিয়ে বাণিজ্য। এরা দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেনি দীর্ঘকাল। নির্বাচনে ওই সব ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়, যারা দুর্নীতির জন্য এবং শ্রেয়বোধের অভাবে সামাজিকভাবে ঘৃণ্যব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েও পেশীশক্তি এবং কালো টাকার জোরে নির্বাচিত হয়ে আসে। এরা সৎ এবং মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের

মনোনয়ন না দিয়ে মনোয়ন দেয় কালো টাকা এবং পেশীশক্তির গডফাদারদের। পার্টি ফান্ডের নামে কোটি কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করে থাকেন। বিদেশে টাকা পাচার করেন।

এই পরিস্থিতিতে হতাশ এবং উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারি না। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি পরম করুণাময়ের কাছে, যিনি দিনকে রাত করেন, রাতকে দিনে পরিণত করেন, সেই বিশ্ববিধাতার কাছে– তিনি যেন আমাদের আলোর পথ দেখান। এই আলোর সন্ধানে বর্তমানে যারা কাজ করছেন, বর্তমান সরকার, দেশকে একটি নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক, সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধশালী, দুর্নীতিমুক্ত দেশ উপহার দেয়ার জন্য কাজ করে চলেছেন। তাদের অভিনন্দন জানাই। এমন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই আপ্তবাক্যটি উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করে। Power corrupts, absolute power corrupts absolutely.

যে বিরাট ব্যাপক কর্মযজ্ঞে বর্তমান সরকার হাত দিয়েছেন তা কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকে ভরা। প্রতি পদে পদে তাদের হোঁচট খাওয়ার ফাঁদ পাতা। শাসনযন্ত্রে রয়েছে অদক্ষ, দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি। এদের নিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন। এই কঠিনকে অতিক্রম করতে হলে সরকারকে দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে হবে। জনগণকে আস্থায় নিতে হবে। তাদের প্রতি যেন জনগণের সমর্থন অব্যাহত থাকে তার জন্য জিনিসপত্রের মূল্য এবং বিদ্যুৎ সংকটের মতো নানাবিধ নাজুক বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৪ জুন ২০০৭

চাঁদা চাঁদাবাজি বনাম সংস্কার

যে কোনো দেশে রাজনৈতিক পার্টি চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। সে অর্থ আসে দলের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে, সমর্থকদের কাছ থেকে এবং সদস্যদের কাছ থেকে। বিত্তশালী ব্যক্তিরা সাধারণত কোনো আদর্শের ধার ধারে না। তারা আদর্শগত কারণে কোনো দলকে চাঁদা দেয় না। তারা ক্ষমতাসীনদের অর্থ প্রদান করে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ-সুবিধা নেয়ার জন্য এবং বিরোধী দলকেও সাহায্য করে যেন তারা ক্ষমতায় এলে তাদের কাছ থেকেও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, যুক্তরাষ্ট্রে এবং ভারতসহ অনান্য দেশে ধনিক শ্রেণীর ব্যক্তিরা, বিভিন্ন ব্যবসায়ী কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলকে বিপুল পরিমাণ অর্থ চাঁদা দিয়ে থাকে। বিশেষ করে নির্বাচনে সেই টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় বহুগুণ বেশি। পার্টি চালাতে হলে অর্থের প্রয়োজন হয়। পার্টির কর্মসূচি, মেনিফেস্টো, সম্মেলন, সেমিনার, বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার, জনসংযোগের জন্য যাতায়াত ব্যয়, অফিস খরচ, স্টেশনারি, স্টাফদের বেতন ইত্যাদিতে এই অর্থ ব্যয় হয়।

আমাদের দেশেও এভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এই ফান্ডের টাকা উপরোক্ত খাতে খরচ করা হয়। কিন্তু এর কোনো স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নেই। দেখা যায়, এতে দলের চাইতে ব্যক্তি লাভবান হয় বেশি। তাই এই অর্থ সংগ্রহকে চাঁদা না বলে চাঁদাবাজি বলাই যথার্থ।

বিদেশে রাজনৈতিক দলগুলো যে অর্থ সংগ্রহ করে তার নিখুঁত হিসাব রাখা হয় এবং যাদের কাছ থেকে অর্থ নেয়া হয় তার জন্য রশিদ প্রদান করাও বাধ্যতামূলক। প্রতিবছর এই হিসাব অডিটের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং প্রকাশ্যে পার্টির কাউন্সিল কিংবা সদস্যদের বড় জমায়েতে তা অনুমোদন করিয়ে নেয়া হয়। কোনো খরচে যদি কোনো সদস্যের আপত্তি থাকে, সেই আপত্তিমূলক সমালোচনার প্রেক্ষিতে হিসাবকে সংশোধন করা হয়। পরের বছর যেন এই ধরনের ভুল না হয় তার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। এতে পার্টি ফান্ডের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত হয়। ওই সব দেশে অর্থ নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয় না তা নয়। কিন্তু ওখানকার মিডিয়া এত শক্তিশালী যে ঘটনা অচিরেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে তদন্ত হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে অপরাধীকে শাস্তি পেতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এও দেখা গেছে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী পর্যায়ের কেউ দোষী সাব্যস্ত না হলেও গণতন্ত্রের স্বার্থে স্ব-ইচ্ছায় পদত্যাগ করেন। উন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমনই প্রবল।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে বড় দলগুলো তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, সমর্থক এবং সদস্যদের কাছ থেকে যে অর্থ চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করে তার কোনো রশিদ দেয়া হয় না। পার্টির বাজেট এবং খরচও কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নেয়া হয় না। প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের অডিটও করতে দেখা যায় না। যেহেতু পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা নেই, সে কারণে এই অর্থ আয়-ব্যয়ের কোনো জবাবদিহিতাও নেই। চাঁদা গ্রহণে কোনো স্বচ্ছতা নেই বলে কে কত অর্থ কাকে প্রদান করল তা জনসাধারণ জানতে পারে না।

বর্তমানে জনগণের এবং রাষ্ট্রের যে অর্থ সম্পদ লুটপাটের তথ্য বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন দলের গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুখ থেকে তাকে চাঁদাবাজি না বলে গুরুতর দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তগিরি বলাই সঙ্গত। একে চাঁদাবাজি বললে অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস পায়। আর চাঁদা বললেও একে জায়েজ করা যায় না। কারণ এর কোনো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। বিত্তশালীরা তাদের অনুপার্জিত কালো টাকা থেকে বহুল পরিমাণে অর্থ ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের কাছে দিয়ে থাকেন বিভিন্ন সময়। কখনো দেন মনোনয়নের আশায়, কখনো দেন নির্বাচনী ফান্ডে, যেন ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তার বিত্তের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। অসৎ উপায়ে অর্জিত যে অর্থ তারা প্রদান করেন তা কালো টাকা বলে ইনকাম ট্যাক্সের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এভাবে তারা কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়ে থাকেন।

চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে বিভিন্ন ইস্যুতে– দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ, সম্মেলন এবং নির্বাচনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি দু-চার-পাঁচ-দশ টাকা করে জনগণের কাছ থেকে পার্টি ফান্ড সংগ্রহের মধ্যদিয়ে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতো। কর্মীদের কাছে নির্দেশ থাকতো যেন তার যথাযথ রশিদ দেয়া হয়। পত্র-পত্রিকায় এসব ব্যাপারে কত টাকা উঠেছে, কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার সঠিক বিবরণ তুলে ধরা হতো। পার্টির নিজস্ব অডিট সেল

ছিল। তারা এই আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুঙ্খভাবে হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। কদাচিৎ কোনো ফান্ড তছরুপের ঘটনা ঘটলে তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হতো। বহিষ্কারের অর্থ শুধু তার পার্টি সদস্যপদ খারিজ করা নয়, তারা সমাজের কাছে এবং পার্টির অসংখ্য সমর্থকদের কাছে নিন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে ঘৃণিত হতেন। এক সময় পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে আমি এসব তথ্য জানি। যারা চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে পার্টির সদস্য, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সমর্থক হিসেবে এখনো বেঁচে আছেন, তারাও এসব তথ্য এবং গণতান্ত্রিক আচরণের কথা জানেন।

চল্লিশ দশকে কলকাতা থেকে 'দৈনিক স্বাধীনতা' প্রকাশের জন্য পার্টির তরফ থেকে যে ফান্ডের আবেদন জানানো হয় তাতে পার্টির লক্ষ লক্ষ সমর্থক সাড়া দিয়ে যে চাঁদা প্রদান করেন, তাদের প্রত্যেককে যথাযথ রশিদ দেয়া হয়েছিল। পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তাদের নামও প্রকাশ করা হয়েছিল। আমার মনে আছে, 'দৈনিক স্বাধীনতা' প্রকাশের জন্য পার্টির শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিলেন। তাও পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছিল।

তখনকার দিনে জাতীয়তাবাদী দলগুলোর যারা নেতৃত্বে থাকতেন তারা অত্যন্ত সরল সাদাসিধে সৎ জীবনযাপন করতেন। নিজের হাতে খদ্দর বুনে সেই খদ্দরের কাপড় পরিধান করতেন। তাদের মধ্যে বাড়ি-গাড়ি কিংবা সম্পদের লোভ-লালসা ছিল না। তাদের প্রতি জনসাধারণের ছিল অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা। ওই সব দলেও দেখেছি আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা এবং কাউন্সিল কর্তৃক বাজেট ও খরচের হিসাব অনুমোদন করিয়ে নিতে।

দুঃখের বিষয় পাকিস্তানের ডামাডোলের মধ্যে আমরা সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারিনি। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো তাতে আমাদের শ্রেয়বোধ সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নীতিহীনতায় গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পায়। হরিলুটের মতো মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীনেরা পূর্ব বাংলার সম্পদ লুট করেছে। এই লুটের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানের বাইশ পরিবার। তারা ছিল বিদেশী। এই বাইশ পরিবারের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে জনগণকে অর্থনৈতিক মুক্তির আশ্বাস দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আমরা নিজের দেশকে লুটপাট করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছি। পঁচা আমের সাথে ভালো আম থাকলে যেমন ভালো আমও পঁচে যায়, তেমনি এই দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা সমাজে আধিপত্য স্থাপন করতে গিয়ে গোটা সমাজকে পঁচনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

যে কোনো দেশে আবিষ্কার, উদ্ভাবন, শ্রম, মেধা, সৎ ও যোগ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোটিপতি শ্রেণী গড়ে ওঠে। তারা পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে শোষণ করলেও তাদের একটি নীতিবোধ থাকে। থাকে দেশপ্রেম। এক পুরুষে কেউ কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পারে না। অথচ এই দুর্ভাগা দেশে কোটি কোটি টাকা লুটপাটের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে প্রায় বাইশ হাজার দেশপ্রেম বর্জিত দুর্নীতি-পরায়ণ ধনী পরিবার। কিভাবে তারা কালো টাকার মালিক হলো, ধনী হলো, দেশ-বিদেশে প্রাসাদোপম বাড়ি করল, বিদেশে অর্থ পাচার করল তার চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্প্রতি জনগণের সামনে উঠে এসেছে। তাদের জঘন্য চেহারা জনসমক্ষে উন্মোচিত হচ্ছে।

এভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে যে ধ্বস নেমে এসেছে, সেই ধ্বসের বোঝা বহন করছে জনগণ– দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বৈদ্যুতিক সংকট, পানি সংকট ইত্যাদি সমস্যার মধ্যদিয়ে। 'কানে বিড়ি মুখে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' থেকে শুরু করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেয়ার মধ্যদিয়ে এবং পরবর্তী ছত্রিশ বছর আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনায় যেসব ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হয়েছেন তাদের যতই বলা হোক ইতিহাসের বড় নায়ক কিংবা নায়িকা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। প্রয়োজনের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। মানুষের শিক্ষা, রুটি-রোজগার, বাসস্থান, চিকিৎসা ব্যবস্থা খানিকটা সম্প্রসারিত হলেও সেই সেবা সাধারণ জনগণের কাছে এখনো পৌঁছেনি। কখনো সামরিক শাসন, কখনো গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার, কখনো স্বৈরতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটা গোঁজামিলের ব্যবস্থা আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে চালু রয়েছে। আর চিরদিনই জনগণের রক্ত ও শ্রমের মূল্যে যেটুকু পরিবর্তন এসেছে তার ফলটা ভোগ করেছে লুটেরা শ্রেণী, জনগণ নয়।

আনন্দের কথা, বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো, বোধহয়, তাদের অতীতের ভুল-ভ্রান্তি বুঝতে পেরেছে এবং আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। যার ফলে তাদের দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, কর্মসূচি সংস্কার

করার উদ্যোগ নিয়েছেন। যেহেতু এই উদ্যোগ উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া নয় বলে তারা স্বীকার করেছেন এবং সরকারও তাই বলছেন, কাজেই আশা করা যায় তাদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে। দেশ পরিচালনায় এবং গণতন্ত্রের অপরিহার্য খুঁটিগুলো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা সততা এবং যোগ্যতার পরিচয় দেবেন।

এই প্রসঙ্গে আরো বলতে চাই, যারা লুটপাটের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে নিয়ে এসেছে, ন্যায়বিচারের মাধ্যমে তাদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়। বহুদিন ধরে জনগণ এই দাবি করে আসছে। এতে ভবিষ্যতে যারা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হবেন তারাও চিন্তা করবেন দুর্নীতির ফল কোনোদিন ভালো হয় না। একদিন না একদিন অপরাধীকে শাস্তি পেতেই হয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে :

You can bluff some people for some time, some people for all the time but not all people for all the time.

১৯ জুন ২০০৭

সাইফুদ্দিন খানের মৃত্যুতে

চট্টগ্রামের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহত্তম যুগের আরেকটি শিখা নিভে গেল সাইফুদ্দিন খানের মৃত্যুতে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালে (২৮ জুন ২০০৭) তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে আমাদের রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়।

তিনি যখন কমার্স কলেজে পাঠরত, তখন থেকেই তাকে আমি চিনি। বন্দিমুক্তি আন্দোলনে, ভাষা আন্দোলনে এবং যুব আন্দোলনে সব সময় তিনি আমাদের পাশে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে ছিলেন। '৫২ সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়। প্রয়াত আবদুল্লাহ আল হারুন এবং মওলানা আহমদুর রহমান আজমী চট্টগ্রাম জেলা কমিটির যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। চট্টগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজে সাইফুদ্দিন খান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে আমরা ঢাকায় যুবলীগ গঠন করি। চট্টগ্রামে এর জেলা শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি যুবলীগের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হন।

ওই সময় তিনি তৎকালীন ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরি গ্রহণ করেন। শ্রমিক নেতা চৌধুরী হারুন-উর-রশিদকে সভাপতি করে তারই উদ্যোগে চট্টগ্রাম ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন গঠিত হয়। তিনি এরও সক্রিয় নেতা ছিলেন। ব্যাংক এমপ্লয়িদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার অপরাধে তিনি, নূরন্নবী, পরিতোষ ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য চক্রবর্তী এবং এ বি চৌধুরী চাকরিচ্যুত হন। যদ্দূর মনে পড়ে, ওই সময়ে বোধহয় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলে, পার্টির মূল নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে না আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচনে প্রচারকার্য চালাবার জন্য কয়েকজন তরুণকে নিয়ে প্রকাশ্য টিম গঠন করা হয়। এই টিমের নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমান জনকণ্ঠের সহযোগী সম্পাদক এটিএম শামসুদ্দিন এবং অপর দু'জন বোয়ালখালীর নেছার আহমেদ ও সাইফুদ্দিন খান। চট্টগ্রাম ওয়াজিউল্লাহ রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের পাশে প্রকাশ্যে পার্টি অফিস খোলা হয়। ওখান থেকে পার্টির আদর্শ প্রচারে এই টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই টিমের উদ্যোগে লালদীঘি এবং জে. এম. সেন হলে দুটি বৃহৎ আকারের জনসভা হয়। ওই সভায় চট্টগ্রাম জেলা গণতন্ত্রী দলের সেক্রেটারি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে সমস্ত বাধা নিষেধ তুলে নেয়ার জন্য এবং রাজবন্দিদের মুক্তি আহ্বান জানিয়ে আমি বক্তৃতা করি, মনে পড়ে।

'৫৮ সালে আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। ওই চোর, ওরা চোর, ওরা বিদেশের চর– এই ধ্বনি তুলে আইয়ুব খান দেশের ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদদের আটক করে পাকিস্তানে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। অনতিকালের মধ্যে তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে দেশ রক্ষা আইনে সাইফুদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়। জেলে বসে পরীক্ষা দিয়ে তিনি বি.কম. পাস করেন। গণআন্দোলনের ফলে আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ওই সময় অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে সাইফুদ্দিন খানও মুক্তি পান।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করা বড় কথা নয়। কমিউনিস্ট হয়ে ওঠা বড় কথা। তিনি সাম্যবাদী আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনে তা অনুবাদ করে কমিউনিস্ট হয়ে উঠেছিলেন। মানুষকে ভালো না বাসলে, মানুষের দুঃখ-কষ্টে তাদের পাশে গিয়ে না দাঁড়ালে, সর্বহারার মুক্তির আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ না করলে কেউ সাচ্চা কমিউনিস্ট হতে পারে না। সাইফুদ্দিন যেমন মানুষকে অকাতরে ভালোবেসেছেন, তেমনি সাম্যবাদী আদর্শকে বিশ্বাসে এবং কর্মে সারাজীবন ধরে রেখেছেন। শত নির্যাতন এবং সব ধরনের দুর্যোগের মধ্যে সাইফুদ্দিন কোনোদিন নিজের আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াননি। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষকে ভালোবেসে গেছেন। সারাজীবন মানবতাবাদী থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

চট্টগ্রাম প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রথম দিকের দিনগুলো থেকে তাকে যেমন রাতে পথেরধারে পোস্টার সাঁটতে দেখেছি, তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারাভিযানে নির্ভীক ভূমিকা পালন করতেও দেখেছি। রাজনৈতিক কোনো কাজকে ছোট কাজ হিসেবে সাইফুদ্দিন কোনোদিন বিবেচনা করতেন না। তাই মাইক

প্রচার করাকে তিনি যেমন ছোট কাজ মনে করতেন না তেমনি পোস্টার সাঁটার কাজকেও তিনি বড় কাজ বলে মনে করতেন। বর্তমান প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে তিনি একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। তার মর্যাদাবোধ ছিল প্রখর। আদর্শ-নিষ্ঠা ছিল প্রখরতর। কোনোদিন অন্যায়ের সঙ্গে তাকে আপস করতে দেখিনি। এই বিপ্লবী সহযোদ্ধার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।

২১ জুলাই ২০০৭

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক

পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইটা কেন হয়েছিল? ব্যক্তিগত রেষারেষি? ক্ষমতার দ্বন্দ্ব? না লড়াইটা শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের বিরুদ্ধে– যে আদর্শের কারণে এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটে। বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায় না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি জাতীয়তাবোধ পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। নির্যাতন গণতন্ত্রহরণ এবং সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপকতা লাভ করে। পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়।

পাকিস্তান মোট পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের– পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং উত্তর-সীমান্ত প্রদেশ আর পূর্ববঙ্গ যার পরবর্তী নাম পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই ভাষা উর্দু নয়। পূর্ব বাংলার তো নয়ই। জনসংখ্যায় পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ছিল শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আমাদের ভাষাও ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যের গৌরবে উজ্জ্বল। হাজার বছর ধরে এ দেশে বিভিন্ন ধর্মের এবং বর্ণের লোক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করে আসছিল। ইংরেজ আগমনের পরও এই সৌহার্দ্য বজায় ছিল। ইংরেজরা আমাদের যতই শোষণ-শাসন করুক না কেন নিজের অজান্তে একটি প্রগতিশীল কাজ করেছিল। এ দেশে প্রবর্তন করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা। যা ইউরোপের র‍্যনেশাঁসের ফসল। অনেকে বলে থাকেন– এই শিক্ষা প্রবর্তনের পেছনে ছিল কেরানি তৈরি করা– আমি এটা বিশ্বাস করি না। তখনকার দিনে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস দেখলে বোঝা যায়– শুধু কেরানি তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য ছিল না। যেহেতু এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল র‍্যনেশাঁসের ফসল, তাই এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাঙালি বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিনির্ভর, মুক্তবুদ্ধি চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলেই এ দেশে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে জগদীশ চন্দ্রবসু, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ দেশে মুসলিম জনসাধারণ এই শিক্ষাকে গ্রহণ করল না মৌলভী এবং অভিজাত শ্রেণীর প্ররোচনায়। ওরা বলেছিল, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে বিবি তালাক হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু প্রতিবেশী সম্প্রদায় এই শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষায়-দীক্ষায়, পেশায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। বহু বছর পর স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বাংলার এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতার চেষ্টায় মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। তখন অনেক দেরি হয় গেছে। তারা প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০ বছর পিছিয়ে পড়ে। কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় হিন্দুদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। আর প্রতিবেশী সম্প্রদায়ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে তাদের এই লেভেলে নিয়ে আসার চেষ্টা করেনি কেবল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছাড়া। এতে ক্রমে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মূলধারা থেকে ছিটকে পড়ে।

এই সুযোগ নিয়ে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন। এতে বঞ্চিত মুসলমানরা মনে করে, পাকিস্তান হলে শিক্ষায়-দীক্ষায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাংলাদেশের মুসলমানরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে, দেশে মধুর ফোয়ারা আর নহর বয়ে যাবে। তাই ১৯৪৬ সালে তারা ভোট দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। পাকিস্তান হওয়ার দেড় বছরের মধ্যে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা দিলেন– উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তখন বাঙালি নড়েচড়ে বসল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যতকে আর খুঁজে পেল না। তারই ফসল একুশের রক্তপ্রপাত এবং তার পথ ধরে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

যে কোনো তথ্য সঠিক কি-না তা প্রমাণিত হয় প্রয়োগের মধ্যদিয়ে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ যে একটি ভ্রান্ত তত্ত্ব তা প্রমাণ হয় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। কারণ ধর্মের ভিত্তিতে যে মুসলমানরা এক জাতি নয় তা বুঝা গেল '৭১-এর গণহত্যার মধ্যদিয়ে, যখন একই রাষ্ট্রের মুসলমানরা সেই রাষ্ট্রের অপর অংশের মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালায়। পশ্চিম পাকিস্তানেরও চারটি প্রদেশ একই জাতিভুক্ত নয়। তারা সিন্ধু, পাঞ্জাবি, বেলুচি ও পাঠান। তাদের ভাষাও এক নয়। সংস্কৃতিও ভিন্ন। কাজেই ভবিষ্যতে যখন জাতীয়তার ভিত্তিতে ওই অংশের মানুষ সচেতন হয়ে উঠবে তখন পাকিস্তান আর টিকবে না।

ধর্মীয় জাতীয়বাদে সব ধর্মের মানুষকে, সব বর্ণের মানুষকে সব ভাষার মানুষকে, সব শ্রেণীর মানুষকে ও সব জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সকল ধর্মের, সকল বর্ণের,

সকল শ্রেণীর এবং সকল জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে একটি সঠিক তত্ত্ব তা প্রমাণিত হয় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

এই মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানিরা এদেশে আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার বাহিনী সৃষ্টি করে এই মীরজাফরদের দিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন পেশার মেধাবী লোকদের হত্যা করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এরা পাকিস্তান এবং আমেরিকার সহায়তায় এ দেশকে আবার ক্ষুদে পাকিস্তান বানানোর অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে তারা। দ্বিজাতিতত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও উস্কানি দিয়ে আসছে।

এখন আওয়াজ উঠেছে, এসব ঘাতক-দালাল যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বিচার করা হোক। এটা একটি অভ্রান্ত জাতীয় দাবি, যা বহুদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে আসছে। এই দুর্বৃত্তরা দম্ভের সঙ্গে এখনও বলে বেড়াচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি গৃহযুদ্ধ। এ বক্তব্য যে আইনত ও সংবিধানবিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার অস্বীকৃতি তা আশা করি বর্তমান সরকার উপলব্ধি করবে। বর্তমান সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল দেশে একটি নিরপেক্ষ অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেয়া। এর বাইরেও সরকার বহু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। কাজেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য রাষ্ট্র বাদী হয়ে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়ায় বাধা কোথায়? তাছাড়া দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন করতে হলে সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অতএব, আমি চাই নির্বাচনের আগেই এসব যুদ্ধাপরাধীর বিচার হোক। রাষ্ট্রের বুকের মধ্যে এত বড় একটা দুষ্ট ক্ষত যদি থাকে তাহলে আমরা কলুষমুক্ত অসাম্প্রদায়িক একটি প্রগতিশীল সমাজ ও জাতিতে পরিণত হতে পারব না।

দৈনিক যুগান্তর
২ ডিসেম্বর ২০০৭

আজও কাঁদে শহীদের আত্মা

১৯৪৬ সালে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় পাকিস্তানের তমসায় আচ্ছন্ন হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তখন বাঙালি নড়েচড়ে বসল। বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎকে আর খুঁজে পেল না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে শুরু হল নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সংগ্রাম। বলা যেতে পারে, বাঙালি হওয়ার সংগ্রাম। একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদদের রক্তে তৈরি হলো স্বাধীন বাংলার মানচিত্র। তারই পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

একাত্তরের ইতিহাস বিকৃতির চক্রান্তে ম্লান হয়ে গেছে, যা সত্য বলে অর্জন করা হয়েছিল, তা আজ মিথ্যায় পরিণত হচ্ছে। যে দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর দেয়া হয়েছিল, তা আবার আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে চলেছে। ধীরে ধীরে এমন একটি বিষবৃক্ষ বেড়ে উঠেছে, যার তলায় ছায়া নেই। যার ডালপালায় ফুল ফোটেনা। যেখানে শুধু দৈত্যরা বাস করে। আমরা ছত্রিশ বছরে দৈত্যবধের সত্য অর্জন করতে পারিনি। ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে যে স্মৃতির নদী তৈরি হয়েছে, সেখানে আমরা আজ বিজয়কে আর খুঁজে পাচ্ছি না। যে কিশোরকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে সমর্পণ করেছিল, তারা বলেছিল, 'তোম বড়া ছোটা হ্যায়। তোমকো ছোড় দেঙ্গে। লেকিন বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' সেই কিশোরটি পাকিস্তানি মেজরের মুখে থুথু দিয়ে বলেছিল– 'নেহি বোলেঙ্গে পাকিস্তান জিন্দাবাদ', জয় বাংলা!' তাকে হত্যা করার পর তার রক্ত থেকে ধ্বনিত হয়েছিল 'নেহি বোলেঙ্গে পাকিস্তান। জয় বাংলা।' সেই স্মৃতি আমরা ভুলে গেছি। সেই চেতনার তরুণ-কিশোরও আর আমাদের চোখের সামনে ভাসে না। সেই দৃশ্য আমাদের অতীতের স্মৃতিতেই বিলীয়মান।

বর্তমান সরকার যে রাজনৈতিক জঞ্জাল দূর করার কথা বলেছে, তাতে আশান্বিত হয়ে তাদের সমর্থন দিয়েছিল। এরা অন্ধকার দূরে করে একটি জ্ঞানভিত্তিক, ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং স্বাধীনতার চেতনায় আলোকিত একটি গণতান্ত্রিক দেশ যদি উপহার দিতে পারেন তাহলে তারা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে থাকবেন। সম্প্রতি দেশব্যাপী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এটা একটা ন্যায়সঙ্গত দাবি। অতীতের সরকারগুলো এ বিচারকার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এবং সেনাপ্রধান মঈন উ আহমেদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ন্যায্যতা স্বীকার করেছেন। আশা করি, এ দাবি কার্যকর করতে তারা দ্বিধান্বিত হবেন না। রাষ্ট্র ও সমাজ যখন দুর্বলকে অত্যাচার করে সবলের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহজ পথ বেছে নেয়, তখন গভীর অমানিশা গ্রাস করে আমার চিত্তকে। বুঝি, মানুষের আত্মপরিচয় বহু বিচিত্র, বহুমাত্রিক, নানাভাবে খণ্ডিত। কখনও গ্রীষ্মের খরতাপ, কখনও শ্রাবণের অঝোর বৃষ্টি, কখনও হেমন্তের ঢেউ তোলা শস্যক্ষেত, শরতের কাশফুল আর বসন্তের নানা রঙের ফুল ফোটা। একেক সময় তার একেক রূপ। ভোর আলোয় ভরা। দুপুর রৌদ্রদগ্ধ। রাত্রি গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেকটা ঋতু বদলের মতো। সপ্তবর্ণকেও ছাড়িয়ে যায়। যারা আমাকে চিরজীবী করতে চান, অথচ সংকটকালে যখন তাদের কাছে অভয় মন্ত্রের প্রেরণা পাই না, তখন আমার চেতনারও মৃত্যু ঘটে।

পরাজয় নিশ্চিত জেনে '৭১-এ পাকবাহিনী সৃষ্টি করেছিল আলবদর, আলশামস। সৃষ্টি করেছিল রাজাকার। উদ্দেশ্য ছিল পরাজয়ের আগে বাংলার গ্রেট সন্তানদের হত্যা করে বাংলাকে মেধাশূন্য করা। সে উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তাকারী গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ এবং তাদের দোসররা এখন সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ– মুক্তিযুদ্ধ ছিল না। ছিল গৃহযুদ্ধ। দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীদের যুদ্ধ। এতে কি মনে হয় না, ছত্রিশ বছরে তারা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে?

আমরা দীর্ঘ ছত্রিশ বছরে এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারিনি। বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এবং সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ নীতিগতভাবে এদের বিচারের ন্যায্যতা স্বীকার করলেও রাষ্ট্র বাদী হয়ে কোনো বিচারের আয়োজন করেনি। তারা বলেছিলেন, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ যদি এদের বিরুদ্ধে মামলা করে, সরকার সহায়তা দেবে। সে আশায় গুড়েবালি। ইতিমধ্যে যারা অভিযোগ করতে গিয়েছিল, থানা কর্তৃপক্ষ সেটা গ্রহণ করেনি। এতে কি মনে হয় না, এদের বিচারে বর্তমান

সরকারের সদিচ্ছা নেই? রাষ্ট্রের বুকের মধ্যে এতবড় একটি দুষ্টক্ষত রেখে জাতি কোনোদিন প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে না।

যে জাতীয়তাবাদের পক্ষে যুদ্ধাপরাধীরা কাজ করছে, সেই জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ। সেই জাতীয়তবাদের মধ্যে সব ধর্মের মানুষকে, সব বর্ণের মানুষকে, সবশ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু যেই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সেটা হল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ। সেই জাতীয়তাবাদে সব ধর্মের, বর্ণের, শ্রেণীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। তাতে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয় না। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রসারিত হলে আমরা আবার দ্বিজাতিতত্ত্বের খপ্পড়ে নিক্ষিপ্ত হবো। কোনোদিন একটি এক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারবো না। অতএব, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করছি। বিচার দাবি করছি সেই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে, যেখানে মুনীর চৌধুরীর আত্মা, গোবিন্দ দেবের আত্মা, সিরাজউদ্দিন হোসেনের আত্মা, শহীদুল্লাহ কায়সারের আত্মা উচ্চকণ্ঠে বলছে, 'আমরাও ছিলাম তোমাদের মতো জীবিত। ভোরের সূর্য ওঠা দেখেছি। সন্ধ্যায় সূর্যের রক্তরাগ দেখেছি। বাগানে ফুল ফোটা দেখেছি। যারা আমাদের হত্যা করেছে, তোমরা যদি তাদের বিচার না কর, আমরা ত্রিশ লাখ শহীদের মিছিল নিয়ে তোমাদের ঘেরাও করবো।' লাখো শহীদের আত্মা আজও কাঁদে। আমার স্বজন, সুহৃদ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মা আজও কাঁদে। যতদিন আমরা ঘাতকদের পাকড়াও করে বিচার করতে না পারবো, ততদিন তাদের এ কান্না থামবে না।

দৈনিক যুগান্তর
১৪ ডিসেম্বর ২০০৭

সংবাদপত্রে মন্তব্য

জনগণ বিপন্নবোধ করছে

চট্টগ্রাম বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন বিভাগীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টের খেলার খবর ও ছবি সংগ্রহ করতে গিয়ে বিনা উস্কানিতে পুলিশের হাতে যে নির্মমভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সাংবাদিকরা– তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। কানসাটের পর চট্টগ্রামে এ মধ্যযুগীয় বর্বরতার ঘটনা ঘটল। এতে দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক শুধু ক্ষুব্ধ নয়, বিপন্নবোধ করছে। যে দেশের সাংবাদিকদের এভাবে লাঞ্ছিত করা হয়, সে দেশে গণতন্ত্রের প্রসার হয় না। আমি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অপরাধীদের শাস্তি দাবি করছি। যেখানে আমরা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য বিদেশে লাখ লাখ ডলার ব্যয়ে লবিস্ট নিয়োগ করছি সেখানে এ ঘটনায় বিস্মিত হয়েছেন বিদেশী সাংবাদিকেরা, অবস্থানরত অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা। চট্টগ্রাম আমার জন্মভূমি। চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে এ মাসেই যুব বিদ্রোহ হয়েছিল। চট্টগ্রাম জন্ম দিয়েছে নবীনচন্দ্র সেনের মতো কবি। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতো পণ্ডিত। আলাওল, দৌলতকাজীর দেশও চট্টগ্রাম। এই ন্যক্কারজনক ঘটনা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগ নেই, রাজনৈতিক দলেরও যোগ নেই। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমরা ট্যাক্স দিয়ে পুলিশ বাহিনী পালন করি। তারা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার বদলে নিজেরা যদি নির্যাতকের ভূমিকায় নামে তাহলে দেশে শান্তি আসবে কি করে? যে পুলিশ এ ধরনের ঘটনার জন্ম দেয় সে পুলিশের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা থাকার কথা নয়। এ ঘটনার জন্য গোটা পুলিশ বাহিনীকে দোষারোপ করতে চাই না। পুলিশের মধ্যেও দেশপ্রেম আছে। সুষ্ঠু তদন্ত করে এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে পুলিশের ভাবমূর্তি যেন পুনরুদ্ধার করা হয় তার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

দৈনিক যুগান্তর
১৮ এপ্রিল ২০০৬

ভাঙনের সুর বাজছে

আমি মনে করি বিএনপির মধ্যে ভাঙনের সুর বাজছে। প্রথমে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী দলত্যাগ করলেন। সঙ্গে যোগ দিলেন সাবেক সাংসদ মেজর মান্নান। শোনা যায়, তাদের সঙ্গে নাকি আরো ৩০ জন বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, পরে তারা বিভিন্ন কারণে মত পাল্টিয়েছেন। পরে এই বিদ্রোহের মঞ্চে যোগ দিলেন আবু হেনা। তার এলাকায় জঙ্গি নেতা আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের তৎপরতা নিয়ে সরকারের কাছে বলে ফল না পেয়ে সংবাদ মাধ্যমে মুখ খোলায় তার অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তাকে পালিয়ে থাকতে হয়। তারপর বিদ্রোহের মঞ্চে আসেন অলি আহমদ। তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে জোট সরকারের সমালোচনা করে চলেছেন। শোনা য়ায়, তিনি নতুন রাজনৈতিক দল করবেন। তারপর ভাঙনের করুণ সুর শোনা গেল অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ও সিলেটে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইলিয়াস আলীকে নিয়ে। বিক্ষুব্ধ অর্থমন্ত্রী পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ঘটনা সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও ওয়াকিবহাল মহল

মনে করেন, এই সংকট এক সময় প্রকট হয়ে উঠবে। এভাবে নির্বাচনের আগে বহু দ্বন্দ্ব সংকট দেখা দিতে পারে। সংকট দেখা দেবে জামায়াতকে নিয়ে, নমিনেশন নিয়ে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গণতন্ত্রের স্বার্থে আমি বিএনপির ভাঙন চাই না। কারণ দেশে বড় দুটি প্রধান দল না থাকলে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করে না। তবে চাই বিএনপির সঙ্গে স্বাধীনতাবিরোধীদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হোক এবং বিএনপি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে বিকাশ লাভ করুক। কারণ জামায়াতের সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে তাদের ভিন্ন সত্তা জামায়াতের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। জাতীয়তাবাদী অসাম্প্রদায়িক আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বিএনপিকে প্রমাণ করতে হবে তারা স্বাধীনতার পক্ষের দল। প্রশ্ন – বিএনপি কি নির্বাচনের আগে ঘর সামলাতে পারবে? নিজে নিজে দাঁড়াতে পারবে? নাকি জামায়াতের কাঁধে ভর দিয়ে বিএনপিকে দাঁড়াতে হবে?

দৈনিক ভোরের কাগজ
১ জুন ২০০৬

তিনি দেশের জন্যই প্রাণ দিয়েছেন

প্রায় ৫০ বছর আগে শামসুর রাহমানের সঙ্গে আমার পরিচয়। যতদূর মনে পড়ে কবি বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি চট্টগ্রাম থেকে 'সীমান্ত' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করতাম ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাস থেকে। পত্রিকাটি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চলে। পরে বন্ধ হয়ে যায় আমার ওপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে। আমি শামসুর রাহমানকে আমার কাগজে লেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম। সম্প্রতি তাঁর একটি লেখায় তিনি উল্লেখ করেছেন, মর্যাদাবান ওই মাসিক পত্রিকায় যেখানে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, অন্নদাশংকর রায়ের মতো লেখকগণ লিখতেন, সেখানে তাঁর মতো স্বল্পখ্যাত একজনের লেখা আহ্বান করে তাঁকে গর্বিত করা হয়েছে। তিনি সীমান্তে বেশ ক'টি লেখা দিয়েছেন।

আমাদের মধ্যে একটা আত্মিক বন্ধন ছিল। তখন আমরা যারা প্রগতিশীল কাজকর্ম ও চিন্তায় নিয়োজিত ছিলাম তাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। আমরা পরস্পরের দুঃখ-কষ্টে বিপদে-আপদে যেতাম। শামসুর রাহমানকে যখন মৌলবাদীরা কুঠার দিয়ে আঘাত করলো, খবর পেয়ে আমি তাঁর বাড়ি গিয়ে অনেকক্ষণ ছিলাম। আমাকে সহজে আসতে দেননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সজ্জন, সদালাপী। কথা বলার চেয়ে শুনতেই ভালো বাসতেন।

তিনি প্রকৃতি, প্রেম ও দেশপ্রেমের কবিতা লিখেছেন। তবে দেশপ্রেমের কবিতাই তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। তবে তাঁর দেশপ্রেমের কবিতা স্লোগানধর্মী হয়নি। একজন কবিকে চেনা যায় তাঁর কণ্ঠস্বর দিয়ে। শামসুর রাহমানেরও একটি স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর আছে। তিনি বাংলা ভাষাভাষীর অন্যতম প্রধান কবি। তার মৃত্যুতে আমি বিশেষ শোকগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায়ও আমৃত্যু তিনি জাতীয় বিভিন্ন সংকটে সংস্কৃতিকর্মীদের ডাকে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ-র‍্যালিতে যোগ দিয়েছেন। না বলেননি। এদিক বিবেচনায় তিনি দেশের জন্যই প্রাণ দিয়েছেন।

দৈনিক ভোরের কাগজ
১৯ আগস্ট ২০০৬

গ্রামীণ ব্যাংক একটি মতাদর্শ

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের। প্রথমত, তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী। দ্বিতীয়ত, তিনি কলেজ জীবনে আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে আমার স্ত্রী যখন ইউনিসেফে কর্মরত তখনও তিনি গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে তার সঙ্গে কাজ করেছেন। আমি অধ্যাপক ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণাকে একটি মতবাদ বলে মনে করি। সত্য বরাবরই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদ ইউনূসের মতবাদ প্রয়োগের পর যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাতে এটি যে একটি মতবাদ তাই প্রতিষ্ঠিত হল। তার এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হল, ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতারা ঋণখেলাপি হয় না। আর ক্ষুদ্র ঋনগ্রহীতাদের শ্রেয়বোধ বড় বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। বড় শিল্পপতিরা ব্যাংকের ঋণ নিয়ে ঋণখেলাপি হন শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ। আর গ্রামীণ ব্যাংকের খেলাপির পরিমাণ .০৯। অনেকেই গ্রামীণ ব্যাংকের এ প্রকল্পকে মহাজনি প্রথা আখ্যা দিয়ে ইউনূসের গৌরবকে ক্ষুণ্ন করতে চান। হয়তো তা তারা বিশ্বাসও করেন। বড় বড় মতবাদ নিয়ে বিতর্ক হতেও পারে। কিন্তু বাস্তবানুগ হয় না। আমি এর প্রমাণ পাই যখন দেখি ছোট ছোট ঋণগ্রহীতার সন্তানরা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ চিকিৎসক , কেউ সিএ পেশায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এটি যে এক বিরাট কর্মোদ্যম তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতারা যদি ঋণ না পেতেন তাহলে তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারতেন না। বছরে মাঝে মধ্যে সুধীজনের সামনে তাদের নিয়ে এসেছেন। এতে অন্য ঋণগ্রহীতারা উৎসাহিত হন। ইউনূস নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় আমি যেমন বাঙালি হিসেবে গর্বিত, তেমনি এটি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি পেল সেজন্যও আমি আনন্দবোধ করি। আজ বিশ্বব্যাপী গ্রামীণ ব্যাংকের রেপ্লিকা হচ্ছে। এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীনেও। সেখানে ড. মুহাম্মদ ইউনূস অর্থ, পরামর্শ এবং অভিজ্ঞ লোকবল পাঠিয়ে সহায়তা করছেন– এটিও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

দৈনিক যুগান্তর
১৪ অক্টোবর ২০০৬

দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

খুবই আনন্দের ঘটনা। দেশের জন্য, জাতির জন্য একটি সুসংবাদ। বিএনপি-জামায়াতকে একঘরে করে সব মতের দলগুলো নিয়ে মহাজোট গঠিত হয়েছে। যেমন করে ১৯৫৪ সালে আমরা সব মতের সব দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মুসলিম লীগের কবর রচনা করেছিলাম। তেমনি স্বাধীনতার পক্ষের সব শক্তিকে একত্রিত করে গঠন করা হয়েছে মহাজোট। তার শক্তি যেমন প্রবল, তেমনি আদর্শ-নিষ্ঠা ও স্বাধীনতার চেতনায় প্রখর। সবার মতামত এক না হলেও জোট সরকারকে পরাজিত করার প্রত্যয়ে তারা যেন অবিচল থাকেন। গণতন্ত্রে মতামতের ভিন্নতা থাকতে পারে। থাকা স্বাভাবিকও। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং সুশাসনের ব্যাপারে সবাই যেন এক এবং অভিন্ন থাকেন।

এ পরিস্থিতিতে যদি তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ পদত্যাগ না করেন, মহাজোটের দাবির ভিত্তিতে যদি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত না হয়, যদি নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে নতুনভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন না হয়, নির্বাচনের সময়সীমা যদি না বাড়ানো হয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে যদি ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা না হয়, নির্বাচন সংক্রান্ত সব দলীয় অফিসারদের অপসারণ করা না হয়, তাহলে মহাজোটের নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

একতরফা নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য তৃণমূল পর্যন্ত গণজাগরণকে ছড়িয়ে দিতে হবে। গণজাগরণকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করতে হবে। যেন দেশের সম্পদ লুণ্ঠনকারী, রাজাকার, আলবদর, আলশামস– যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে, ৩০ লাখ লোককে হত্যা করেছে, ১৪ ডিসেম্বর দেশকে মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে কীর্তিমান বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, সেসব জামায়াতপন্থী এবং তাদের সহযোগী বিএনপির দুর্নীতিবাজ নেতা, মন্ত্রী, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক যেন বিচারের সম্মুখীন হয়।

আন্দোলনে নির্বাচনভিত্তিক দাবি ছাড়াও সংবিধানে স্বাধীনতার চেতনার স্তম্ভগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি সংযোজিত করা দরকার বলে আমি মনে করি। দীর্ঘ ৫ বছর যারা লুটতরাজ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ কুক্ষিগত করেছে, বিদেশে অর্থ পাচার করেছে, তাদের বিচারের দাবিও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যাতে যারাই ক্ষমতায় আসুক এসব দাবির প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ভবিষ্যতে যে সরকারই আসুক, তারা যেন দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়। তার জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধেও দাবি তুলতে হবে।

দৈনিক যুগান্তর
২০ ডিসেম্বর ২০০৬

আশু বাস্তবায়ন চাই

নতুন উপদেষ্টা পরিষদ এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত কাজ করেছেন এবং যেসব কাজ হাতে নিয়েছেন, তা জনগণের সমর্থন লাভ করেছে। বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণের কাজ তারা ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। কালো টাকার মালিক এবং সন্ত্রাসীদের উচ্ছেদ করার কাজেও হাত দিয়েছেন। এই অভিযানে কোনো নিরপরাধ লোককে ধরা হবে না বলে প্রধান উপদেষ্টা তার ভাষণে বলেছেন। তিনি স্বচ্ছ-শান্তিপূর্ণ-গণতান্ত্রিক এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিরও আশ্বাস দিয়েছেন। আমার সবচাইতে ভালো লেগেছে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের আয়ের উৎস, সমুদয় সম্পত্তি ও অর্থোপার্জনের বিশদ বিবরণ দাখিল করা বাধ্যতামূলক করেছেন। গডফাদার, দাগি অপরাধী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, সমাজবিরোধী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেবেন বলেও ভাষণে উল্লেষ করেছেন তিনি। তার আরেকটি বক্তব্য আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। সেটা হলো ইসলামের নামে ধর্মীয় উত্তেজনার বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছেন। বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, মহাঐক্যজোট– নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ভোটার আইডি কার্ড ও স্বচ্ছা ব্যালট বাক্সের যে দাবি তুলেছে, সেই দাবিগুলো পূরণ না হলে আবারো সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই দাবিগুলো পূরণ করা দরকার। এতে যদি সময় একটু বেশিও লাগে, তাও জনগণ মেনে নেবে বলে আমার বিশ্বাস।

দৈনিক ভোরের কাগজ
২৩ জানুয়ারি ২০০৭

চবি নাট্যকলা বন্ধের প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ

শুনলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা শাখা উঠিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ বলে আমি মনে করি।

নাট্যকলা বর্তমান যুগে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। সরকার বর্তমানে যে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের কথা বলছে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে নাটক এক্ষেত্রে সবচেয়ে জোড়ালো ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া সামাজিক পিছুটান, কুপমণ্ডুকতা, ধর্মান্ধতা– যা মানুষকে অন্ধকার যুগের দিকে ঠেলে দেয়– এর বিরুদ্ধে নাট্যকলা প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। কাজেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা শাখা বন্ধের সিদ্ধান্ত একটি আত্মঘাতী কাজ হবে বলে আমি মনে করি।

সুপ্রভাত বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম
২২ এপ্রিল ২০০৭

দুর্গত এলাকার নিঃস্ব ও অসহায় মানুষ কিস্তি শোধ করবে কিভাবে?

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুই দুইবার বন্যায় দেশের সম্পদ ও জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এদের পুনর্বাসন কাজ শেষ হতে না হতেই সিডর নামক এক ঘূর্ণিঝড় আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে এরকম দুর্যোগ আগে কখনো এরকমভাবে ঘটেনি। বর্তমান সরকার তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে এই সংকটের ব্যবস্থাপনা করে চলেছেন। ঘূর্ণিঝড়ের আগে সতর্কতার সঙ্গে লোকজনকে যদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা না হতো তাহলে লক্ষাধিক লোক এ ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুবরণ করতো। এই সরকারের একটা সুবিধা ছিল যে, অতীতে ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবেলা করার জন্য বহুস্থানে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। বর্তমানে অস্বাভাবিক কষ্টের মধ্যে এই অঞ্চলের লোকেরা বাস করছে। মাথার উপড়ে ছাউনি নেই। শীতের বস্ত্র এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে দুর্গতদের কাছে পৌঁছেনি। এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে জনগণ দিনযাপন করছে। আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অতীতের কুখ্যাত মহাজনদের মতো কিছু কিছু এনজিও তাদের এই বিপদের দিনে সাহায্য করা তো দূরের কথা তাদের কাছ থেকে কিস্তি আদায় করতে উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের এই হৃদয়হীনতা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে না। চিরকাল বাংলার মানুষ আপদে-বিপদে দুর্যোগে দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। যে সমস্ত এনজিও কিস্তি উসুলের নামে দুর্গতদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে আমি তার তীব্র নিন্দা করছি। আশা করি, তারা এই কাজ থেকে বিরত থেকে শুধু কিস্তি মওকুফ নয়, ঋণের সুদও মওকুফ করে দেবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ ডিসেম্বর ২০০৭